জীবন-মৃত্যু

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী
ও
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়

চিত্রা পাবলিশিং কোং
১১, কানাইধর লেন, কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীশান্তিকুমার রায়চৌধুরী
চিত্রা পাবলিশিং কোং
১১, কানাইধর লেন, কলিকাতা

দাম—পাঁচসিকা

মুদ্রাকর :
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩৷১৷১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্যিকবন্ধু শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুকে—

জীবন-মৃত্যু

জীবন-মৃত্যু

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রামটীর নাম ইন্দ্রাণী। বেশ বড় গ্রাম। ছোটখাট একটী সহর বলিলেও চলে। বাজার, হাট, স্কুল, হাসপাতালতো আছেই; তাহার উপর আরও অনেক কিছু আছে যাহা সহরেই কেবল দেখা যায়। গ্রামের বসতি অত্যন্ত ঘন এবং লোক সংখ্যা দশ হাজারের কম নয়।

দুইশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন অপরেশবাবুর এক পূর্ব্বপুরুষ এই মাঠের মধ্যে জনকয়েক লোক সঙ্গে আনিয়া একখানি বাড়ী তৈয়ারী করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি শাসন করিতেন। প্রচুর জায়গা। কাজেই একটী বাগান বাড়ী হইল এবং খাস-জমি চাষের জন্য জোড়া কতক বলদ ও মহিষ আমদানী করা হইল। চাষের জন্য প্রথমে ভিন্ন গ্রামের লোক আসিয়া চাষ করিয়া নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যাইত। সময়ে সময়ে তাহারা কাছারী বাড়ীতে রাত্রিও কাটাইত। এই ভাবে বৎসর দুই চালাইয়া তিনি স্থির করিলেন, চাষে যাহারা খাটিবে তাহাদিগকে চব্বিশ ঘণ্টা এইখানে

এই কাছারী বাড়ীতেই থাকিতে হইবে নচেৎ চাষের ব্যাঘাত ঘটিবে। অগত্যা তাহাদের জন্য আর একখানি বাড়ী তৈয়ারী হইল।

যাহারা বিদেশে থাকে না, গ্রামের বাহিরও বড় হয় না, স্ত্রী পুত্র কন্যা ও ছোট চালাঘর লইয়া যাহারা আনন্দেই দিন কাটায়; ইহাতে তাহাদের প্রথমটা বিশেষ বাধবাধ ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু কি করিবে পেটের দায়! তাহার উপর জমিদারের দায়! মানিতে বাধ্য হইলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা সুযোগ পাইলেই দুপুর রাত্রে বাড়ী পালাইত এবং ভোরেই আসিয়া যথারীতি কাজে যোগ দিত।

এমনিভাবে কয়েক মাস কাটাইয়া একদিন তাহারা সকলে মিলিয়া একযোগে জমিদারের কাছে নিজেদের জন্য দুই এক কাঠা করিয়া জমি প্রার্থনা করিল ঘর-বাড়ী করিয়া বাস করিবে বলিয়া। তাহাও মঞ্জুর হইল। অবশেষে দেখা গেল আরও সাত আটখানা বাড়ী জমিদারের কাছারী বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া একে একে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল।

কয়েক বৎরের মধ্যে প্রত্যেকে জমিদারের অনুগ্রহে দুই-দশ বিঘা জমি নিজেদের বলিয়া দাবী করিবার অধিকারও পাইল। আরও কিছুদিন পরে তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ভাল করিয়া ঘর বাড়ী করিয়া গোটা কয়েক মরাই বাঁধিয়া মধ্যবিত্ত চাষী সাজিয়া বসিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জমিদারের পরামর্শদাতা হইয়াও উঠিল। প্রজাদের সংখ্যা সীমানাবৃদ্ধির সঙ্গে জমিদারেরও সীমানা বাড়িয়া চলিতে লাগিল। তখন একটি কাছারী বাড়ীতে আর কুলায় না। কর্ম্মচারীদের থাকিবার বাড়ী, নায়েববাবুর থাকিবার বাড়ী, জমিদারবাবু মধ্যে মধ্যে আসেন তাহার জন্য

একটী বাড়ী তৈয়ারী করান বিশেষ প্রয়োজন। কাজেই একে একে সে অভাবগুলিরও পূরণ হইয়া গেল।

কাছারী বাড়ীর পাশ দিয়া দামোদর নদী চলিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মে চড়া পড়িলে সূর্য্যরশ্মিতে তাহার বালিগুলি চিক চিক করিয়া জ্বলে। কোথাও অল্প জল স্থির হইয়া আছে; কোথাও বা চির চির করিয়া বহিয়া চলিতেছে; দেখিতে বেশ লাগে। তারপর বর্ষা আসিলে দুকূল ভাসাইয়া লইয়া নদী ভীমগর্জ্জনে নাচিয়া নাচিয়া চলে। অনেকদূর পর্য্যন্ত জলছাড়া কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কেবল কাছারী বাড়ী ও তাহার আশ্রিত পাশের বাড়ীগুলি নদীর দিকে এক দৃষ্টে যেন তাকাইয়া থাকে। কাছারী বাড়ীতে বসিয়া এদৃশ্য দেখিতে বেশ লাগে।

জমিদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যখন কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন জমিদারী দেখাশুনা করিতে তাঁহাকে এখানে মধ্যে মধ্যে আসিতে হইত। স্ত্রীর নিকট হইতে তিন দিনের মেয়াদ করিয়া লইয়া তিনি কোনবারই আট দশ দিনের মধ্যে ফিরিবার কথা মনে আনিতেন না। এই কাছারী বাড়ীতে বসিয়া যখন তিনি নদীর দিকে আর পাশের সবুজ ক্ষেতের দিকে চাহিতেন, তখন বিরহী প্রিয়ার কথা না ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন না।

কাছারী বাড়ী আসিলে যখন সহজে তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া ঘটিত না, তখন একদিন স্ত্রীর কাছে তিনি কথা তুলিলেন—"হ্যাঁ গো, চল না একবার নতুন যায়গায়। সেখানে গেলে যখন সহজে আসা হয় না, এদিকে তোমার জন্যেও মন প'ড়ে থাকে এখানে। দোটানায় প'ড়ে মনও ভাল থাকে না, সেক্ষেত্রে বরং তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দিন কয়েক বেশ কাটিয়ে আসা যাক্।

নতুন জায়গায় কিছুরই অভাব নাই। বেশ মন টিকবে তোমার একথা সত্যি ক'রে বলতে পারি।"

তারপরে সপরিবারে জমিদার চলিলেন নিজের জমিদারীতে। ধুমধামের অন্ত নাই : নূতন পাকাবাড়ীতে গিয়া তাঁহারা উঠিলেন। চারিদিকের গ্রামগুলির প্রজারা রাজারাণী দর্শনে আসে। প্রজাদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজনেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা হইল। এমনি ভাবে সাতদিন সপরিবারে কাটাইয়া অবশেষে ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নূতন যায়গাটা জমিদারপত্নীর ভালই লাগিল। নদীর ধারে বেড়াইতে, নদীতে স্নান করিতে সত্যই ভাল লাগিবার কথা। এই কয়দিনে এখানে তাঁহার কেমন যেন মায়া বসিয়া গেল। তিনি একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তাঁহার নাম ইন্দ্রাণী। স্বামীকে অনুরোধ করিয়া নূতন গ্রামটীর নাম তাঁহার নামেই রাখিতে বলিলেন। এতদিন যে গ্রামটী এক অখ্যাত নামে পরিচিত ছিল জমিদারপত্নীর অনুরোধে তাহার নাম হইল ইন্দ্রাণী। আর নদীর ধারে যেখানে খেয়াঘাট আছে, যেখানে যাত্রীরা বিশ্রাম লইত, সেই বটগাছের পাশে একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামে বৎসরে একবার মেলার ব্যবস্থা করিয়া গ্রামটীকে জমকাইয়া তুলিলেন। এইরূপে নূতন গ্রাম সৃষ্টি হইল।

তারপর দেখিতে দেখিতে খেয়াঘাটের কাছে একটী মুদিখানার দোকান বসিল। দুই চারি মাসের মধ্যে ঐ দোকানী মুদিখানার একপাশে মনিহারী ও অন্য পাশে বেগুনী-ফুলুরী ও মিষ্টান্নের দোকান খুলিয়া দিল।

বস্তীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সংখ্যা দাঁড়াইল ত্রিশ।

গ্রামের অনেকে নিজেদের মেয়ের বিবাহ দিয়া জামাইকে কিছু জমি-জমা দিয়া বাড়ীর কাছে বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিল ; অনেক সুবিধাও তাহার জুটাইয়া দিল।

এদিকে জমিদারের বংশ বাড়িতে লাগিল। অথচ জমিদারী আগেকার মতই রহিল। ফলে জমিদারী ভাগ হইতে লাগিল। এই রকম ভাগের ভাগ হইতে হইতে একজনের ভাগে পড়িল কেবল মাত্র ইন্দ্রাণী গ্রাম। তিনি জমিদারী দেখা শুনা করিতে আসিয়া প্রায়ই সেখানে থাকিতেন। দুই চারি বৎসরের মধ্যে দেখা গেল তিনি ইন্দ্রাণী গ্রামেই স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

জমিদার যখন স্বয়ং গ্রামে বাস করিতেছেন, তখন গ্রামে যেগুলি থাকা দরকার সেগুলি একে একে স্থাপিত হইতে লাগিল। এমনি করিয়া বাড়িতে বাড়িতে ইন্দ্রাণী বেশ গ্রামের মত হইয়া উঠিল। এখন আর গ্রাম না বলিলে চলে না। ডাঙ্গাপাড়া এমনি করিয়াই সর্ব্বত্র নূতন নাম লইয়া গ্রামের আকার লয়, পরে সহরও হইয়া উঠে।

অপরেশবাবু এই গ্রামের বর্ত্তমান জমিদার। বয়স চল্লিশ হইবে। স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রজাদের লইয়া বেশ আনন্দেই দিন কাটাইতেছেন। সকাল সাতটায় বসেন কাছারী বাড়ীতে। দুই একটী করিয়া অনেকগুলি প্রজা আসিয়া জমে। নানা জনের নানা অভিযোগ তাঁহাকে শুনিতে হয়।

কাছারী বাড়ীতে মস্ত বড় ফরাস পাতা। মধ্যে মস্ত বড় বালিসে ঠেশ দিয়া বসেন জমিদার স্বয়ং। একধারে বসেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, অন্যধারে

বসেন মিত্র মহাশয়; একজন পুরোহিত অন্যজন নায়েব। পায়ের দিকে বসে নগেন মণ্ডল, পরেশ ঘোষ, মন্মথ কর্ম্মকার ও সতীশ ঘোষ। সকলেই বাছা বাছা প্রজা ও বৃদ্ধ। মধ্যে মধ্যে প্রভাত হালদার, মণি ঘোষও দেখা দেয়। দূরে মোড়ায় বসে ভোলা মাঝি, হরিশ হাজরা ও বিপিন হাজরা। এই তিন জন পেয়াদা।

সেদিন সকাল হইতেই নিত্যকার মত জোর দরবার বসিয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজ, কৃষি, বাণিজ্যের নানা প্রসঙ্গই উঠিয়াছে। হঠাৎ পরেশ ঘোষ কথা তুলিল—"বিষ্ণু মাঝির জমিটা তার দাদা জোর ক'রে কেড়ে নিতে চায়। আমি যদি সে সময় না থাক্‌তাম্, তাহলে একটা খুনোখুনি না হ'য়ে যেতো না! সে বলে, এই কাচি জমিটার ওপর তার এত টান কেন? তার ভাই বলে, ভাগে যাই পড়ুক না কেন ঐ কাচি জমিটা তার না হ'লে চলবেই না। সে ছোট বেলা থেকে ঐ জমিটাকে ভাল ক'রে খাইয়ে এসেছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ যে করেছে সেই মরেছে। স্বয়ং রাজা যখন এখানে আছেন বিবাদ কেন হবে? এখানে এলেই সব জলের মত মিটে যাবে।"

—"তাতো বটেই, তাতো বটেই, স্বয়ং রাজা!" কয়েকজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল।

নগেন্দ্র মণ্ডল কথা তুলিল—"কাল দুপুরের বেলায় যে একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল শুনেছেন কি কেউ? ভোলা হাজরার ভাই একজন কাবুলি-ওয়ালার কাছ থেকে গেল বছরে একটা কোট কিনেছিল। দাম তার তিন টাকা। ক'দিন ঘুরে ঘুরে সেদিন ঐ কাবুলি ব্যাটা ভোলার ভাইকে

পাকড়াও করে। দুজনের হাতাহাতির উপক্রম আর কি! সতীশ খুড়ো গিয়ে তবে সেদিনকার মত তাকে বাঁচায়। কি আশ্চর্য্য, বেটারা সাত সমুদ্র তের নদী থেকে এসে আমাদের ওপর কি অত্যাচারই না সুরু করে দিয়েছে। যে জিনিষের দাম দেড় টাকা, নেয় তিন টাকা, ডবল, একেবারে ডবল।"

মিত্র মহাশয় সরিয়া গিয়া নগেনের মুখের কাছে হাত রাখিয়া বলেন—"কেন হবে না, ডবলই বা কেন নেবে না? বিনা বন্ধকীতে ধার, তার ওপর এক বছর পরে টাকা। অসময়ে অমন কে করে হে?"

নগেন একটু আগাইয়া আসিয়া বলে—"তা কেউ না করুক, এ রাজত্বে অমন চড়া সুদের ও কড়া তাগাদার চলন নাই। বেটা এসে নাকি ঘরের চাল লাঠি দিয়ে বেড়িয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে, বউকে অপমান! একি কথা! আমি হ'লে কি আর কাবুলিকে ঘরে ফিরে যেতে দিতাম। না হয় ফাঁসীই হ'ত। কিন্তু এ অত্যাচার কি আর সইতে পারা যায়?"

অপরেশবাবু গম্ভীর হইয়া বলেন—"কাবুলিওয়ালাদের বড় অত্যাচার শোনা যায়। অত্যাচারের মাত্রাও এখন দেখছি কিছু বেড়েছে। আহা গরীব মানুষদের অমন ক'রে নিতে বড় কষ্ট হয়। আমিতো গেলবারই বলেছিলাম, ওদের কাছ থেকে কিছু নিও না! আর ওরা যেন গাঁয়ে না ঢোকে দেখো তোমরা।"

বিপিন হাজরা হাত কচলাইতে কচলাইতে বলে—"বাবু, ও এখান থেকে জামা কেনে নাই। শ্বশুরবাড়ী থেকে কিনে এনেছে।"

কাবুলিওয়ালার প্রসঙ্গ চাপা দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নগেন মণ্ডলের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করে—"বসন্ত গোয়ালার শ্রাদ্ধের আয়োজন সব ঠিক্ ঠাক্ করে দিয়ে এসেছি, হঠাৎ শুনলাম তাদের কে এক জামাই এসে

সে সব পণ্ড করে দিয়েছে। তারা কোন রকমে সারবে বলেছে নাকি! এ দুর্ব্বৎসরে তারা বেশী খরচ করতে চায় না। কি ব্যাপার বলতো? অত টাকা রেখে বুড়ো ম'লো, শেষে বেটারা নমঃ নমঃ করে শ্রাদ্ধ সারবে? কি অন্যায় দেখতো।"

নগেন মণ্ডল যাহা উত্তর দিল তাহার অর্থ একরূপই। সেও এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না। তবে বসন্ত গোয়ালার জামাই যে একজন বেশ শিক্ষিত লোক এবং বর্দ্ধমানে বড় একটা চাকুরি করে তাহা সত্য। সুতরাং এ গ্রামে তাহার কিছু প্রতিপত্তি আছে।

—"এ দুর্ব্বৎসরে বেশী খরচ আমিও মোটেই পছন্দ করি না। সে টাকা রেখে গেছে ব'লে ছেলেদিকে তার শ্রাদ্ধে সব খরচ করতে হবে এর কোন মানে হয় না।" বলিয়া গম্ভীরভাবে অপরেশবাবু আসন ছাড়িয়া উঠিলেন।

জমিদারের মুখে হঠাৎ এই ধরণের কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। সকলের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

ইহার পর আরও পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন ইন্দ্রাণী গ্রামের রূপ একেবারে অন্যরকমে দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের প্রাচীন জমিদার-বংশের নামও এখন শোনা যায় না; কারণ যাঁহারা প্রায় তিন পুরুষ হইতে এই গ্রামের বর্ত্তমান জমিদার হইয়াছেন তাঁহারা পুরাস্মৃতি বিলোপ সাধনে বদ্ধপরিকর ও নিজেদের প্রচার কার্য্যে যত্নবান। একটা অস্পষ্ট ছায়াপাত মাত্র প্রাচীনদের মনের মধ্যে হয়তো কখনও কখনও জাগে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রাণী গ্রামের মধ্যে কেবল অমরনাথই কলিকাতায় চাকুরি করে। ছুটি পাইলে মধ্যে মধ্যে সে বাড়ী আসিত। গ্রামে তাহার যথেষ্ট খাতির আছে। স্বভাব ভাল বলিয়া সকলেই তাহার সুখ্যাতি করে। ছুটি উপলক্ষে বাড়ী আসিয়া সে কিন্তু সুখ পাইত না। একদিন নিদারুণ অপমানে ব্যথিত হইয়া দিন কাটান সম্ভব নয় ভাবিয়া পরদিনই অমরনাথ চলিয়া গেল। তাহার চলিয়া যাওয়ার পর হইতে গ্রামে নানারকম গুজব রটিতে লাগিল। আসিবার সময় চপলা একবারও তাহার সঙ্গে দেখা করে নাই। নিতান্ত অবজ্ঞাভরে তাহার পানে ফিরিয়াও তাকায় নাই। নূতন বৌয়ের এই দম্ভ কোন যুবকই সহ্য করিতে পারে না, অমরনাথের পক্ষে যতদূর সম্ভব হইয়াছিল তাহা শুনিলে কেহই আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিত না। অমরনাথের মত ছেলেকে লইয়া যে এত অল্পদিনও ঘর করিতে পারিল না তাহার মত নিষ্ঠুরা ও ঝগড়াটে মেয়ে আর এতল্লাসে মেলে কিনা সন্দেহ!

অমরনাথ কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া কলিকাতায় আসিল। পথে সপ্তগ্রামে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে স্ত্রীকে পৌছাইয়া দিয়া সে একেবারে চলিয়া আসিল। তাহাদের ভিতরের খবর গ্রামের কেহই জানিতে পারিল না। তবে অমরনাথ ছুটি লইয়া যখনই বাড়ী আসিত তখনই চপলার সঙ্গে কলহ বাধিত। চপলাই কলহ করিত, গালি দিত এবং যাহা খুসী বলিতে ত্রুটী করিত না। অথচ অমরনাথ কোনদিন কোন কিছু বলিত না এ বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ।

জীবন-মৃত্যু

অল্প বয়সে অমরনাথের বাপ মারা যান। সম্প্রতি তাহার মা মারা গিয়াছেন। বাড়ীতে স্ত্রী ছাড়া আর কেহ নাই। কিছুদিন হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে এত বিভ্রাট ঘটিতে পারে এবং এই সংসারের উপর দিয়া এত বড় ঝড় বহিতে পারে তাহা গ্রামের কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই।

২

ইহার পর প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অমরনাথের কেহ কোন খোঁজ খবর পায় নাই। কলিকাতার কোথায় তাহার মেস তাহাও কেহ জানিত না। কাজেই অমরনাথ সম্বন্ধে সকলে একরূপ আশাই ছাড়িয়া দিয়াছিল।

কলিকাতায় আসার পর অমরনাথ স্ত্রীকে আর কোন পত্র দেয় নাই। পৌরুষে আঘাত লাগিলে যাহা সম্ভব সে তাহাই করিয়াছিল। চপলার তরফ হইতেও কোনও সংবাদ আসে নাই। অমরনাথ ৪৫৲ টাকা মাহিনায় কোন একটি অফিসে চাকুরী করে। তাহাতেই ভালভাবে তাহার সংসার চলিয়া যাইত। চপলার ব্যবহারে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। বিবাহের উপর তাহার অশ্রদ্ধার সীমা নাই। তাই সে সঙ্কল্প করিয়াছে আর স্ত্রীর সহিত কোন সম্বন্ধ সে রাখিবে না বা বিবাহ করিবে না। যে মেসে সে থাকিত সেখানে কাহাকেও ঘুনাক্ষরে কোন কথা জানাইল না। অফিসে মধ্যে মধ্যে তাহার সম্বন্ধে কথা উঠিত বটে কিন্তু সে নির্ব্বিকার!

চপলার বাপ-মা অমরনাথের ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কোন কথাবার্ত্তা নাই, চিঠি পত্র দেওয়া নাই, কি ব্যাপার! অনেক খোঁজ খবর লইয়া কিছুই করিতে পারলেন না। একদিন তিনি ইন্দ্রানী গ্রামে গিয়া

অমরনাথের খোঁজ লইলেন। গ্রামের কেহই তাহার সংবাদ দিতে পারিল না। সেখানে একখানি ঘর ছাড়া তাহার আর কিছু ছিল না। তাহাও বন্ধ। অমরনাথের আত্মীয় স্বজনেরা যথেষ্ট খোঁজ করিয়াছে। অগত্যা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতায় তাহার ঠিকানায় খোঁজ করিয়াও তাহাকে পাইলেন না। কিছুদিন হইল সে অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে।

সকলে চপলাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ কি করিয়া গুজব রটিল যে, অমরনাথ মারা গিয়াছে। কিন্তু সংবাদ সঠিক কি না সেজন্য কিছুদিন সে খবরটী চাপা রাখিল। শেষে কয়েক বছর পরে বাধ্য হইয়া তাহা প্রকাশ করিতে হইল, নইলে গ্রামে বাস করা দায়। বিধবা মেয়ের সধবার আচার বিচার কেহই সমর্থন করিবে না। দাম্ভিকা চপলার সকল দম্ভ গেল!

অমরনাথের সে চাকুরী গেল। ব্যবসা ফেল হইয়া যাওয়ায় তাহাকে অন্য কোথায় চাকুরীর ব্যবস্থা করিতে হইল। চাকুরী যাওয়ার দিন কয়েক মধ্যেই সে সংবাদ পাইল তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলে মুঙ্গেরে চলিয়া গিয়াছে। তাহার খবর কেহ না পাইলেও সে শ্বশুরবাড়ীর খবর মধ্যে মধ্যে পাইত। সংবাদপত্রে সেখানকার খবর মধ্যে মধ্যে বাহির হইত। ইচ্ছা হইল একবার এই সময়ে মুঙ্গেরে গেলে হয়তো তাহার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইত কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে সেখানে যাইতে তাহার বিবেকে বাধিল। নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। সামান্য চাকুরী যে গ্রাহ্য করিত না তাহার কাছে চাকুরী নাই এ সংবাদ জানাইবামাত্র তাহার ভাগ্যে কি লাভ হইবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারিল না।

জীবন-মৃত্যু

মাঘমাসের পড়ন্ত বেলায় অফিসে কাজ করিতে করিতে হঠাৎ ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। চারিদিক হইতে চীৎকার উঠিতে লাগিল। অমরনাথ অফিস ছাড়িয়া তিন লাফে সামনের পার্কে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার সামনে একখানি জরাজীর্ণ বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা ভয়ে শুকাইয়া গেল। ইটের গুঁড়া সমস্ত পার্ক অন্ধকার করিয়া দিল। বাড়ীর মধ্য হইতে আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। পাশের কতকটা দেওয়াল পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোকের সমাধি হইয়া গেল। একটা বিকট চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি, কলরব, আর্ত্তনাদ অমরনাথকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। সে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছিল।

ভূমিকম্প থামিয়া গেল। অমরনাথ তাহার অফিসে ফিরিয়া আসিল। পরের দিন সংবাদপত্রে ভারতের বহুস্থানের ভূমিকম্পের সংবাদ বাহির হইল। সেবার বিহারের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানকার প্রত্যেক সহর ভূমিকম্পের ফলে নিশ্চিহ্নপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পরে খবরের কাগজে একটি সংবাদ দেখিয়া অমরনাথের সকল আশার সমাধি হইয়া গেল। তাহাতে লেখা ছিল, মুঙ্গেরের অন্যান্য পরিবারের মধ্যে নিবারণ সরকারের সকলেই মারা গিয়াছেন। কেবল তাঁহার বিধবা কন্যা ও শিশুপুত্র কোন রকমে বাঁচিয়া গিয়াছে।

নিবারণবাবু অমরনাথের শ্বশুর। শ্বশুরবাড়ীর সকলেই যখন মারা গিয়াছে তখন তাহার স্ত্রী অবশ্যই মারা গিয়াছে। যাক অমরনাথ নিশ্চিন্ত হইল।

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করিয়া সকলকে তাহার স্ত্রীর ও শ্বশুরবাড়ীর কথা

জানাইল। তাহার বন্ধুদের মধ্যে যেন শোকের ছায়া পড়িয়া গেল। অমরনাথ স্ত্রীর সঙ্গে এতদিন ধরিয়া কোন সম্বন্ধ রাখে নাই বলিয়া যত দুঃখিত, স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে যেন আরও দুঃখিত হইল। তাহার মনে হইল সে যেন সর্ব্বস্ব হারাইল এতদিনে। নিদারুণ ব্যথায় তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

সবই সহ্য হয়। ইহাতো সামান্য ব্যাপার। এতদিন পরে অমরনাথের যেন কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ঘর সংসার করিবার বাসনা এতদিন তাহার মনের কোণে ছিল কিনা কেহই তাহার সন্ধান লয় নাই। কিন্তু এখন অমরনাথকে দেখিলে মনে হয় তাহার মনে যেন বিন্দু বিন্দু করিয়া কামনার বহ্নি জমিতেছিল।

একদিন বন্ধুরা ধরিয়া বসিল—"আর একটা বিয়ে করো হে!"

অমরনাথ হাসে। কোন উত্তর দেয় না।

বন্ধুরা ইহাতে আরও উৎসাহ পায়। বলে—"ব্যাটা ছেলে, চাকরী করছো তার ওপর সুপুরুষ, বয়েসও কম, বিয়ে না ক'রলে চলে?"

—"না ভাই আর বিয়ের কথা না।"

—"থাম, আমরা সব ব্যবস্থা করছি। দেখিস এমন মেয়ে আনব যে আর ঘর থেকে নড়তে চাইবি না।"

অমরনাথ কেবল হাসিতে লাগিল।

উদ্যোগী যুবকবন্ধুদের প্রশংসা না করিয়া পারা গেল না। অমরনাথ দেখিল মাস তিনেকের মধ্যে তাহার বন্ধুরা এক জায়গায় তাহার বিবাহের সব আয়োজন করিয়াছে।

উদ্যোগী বন্ধুরা রবিবারে একটা দিন করিয়া পাত্রী দেখিতে চলিয়াছে

কলিকাতার কাছে বারাসতে। চিঠি লিখিয়া জানান হইয়াছে, পাত্রের তিনবন্ধু পাত্রী দেখিতে যাইবে। যেন সব ব্যবস্থা থাকে।

বারাসতে পাত্রী দেখিতে বন্ধুসহ অমরনাথ চলিয়াছে। মনে কামনার বহ্নি ক্রমে ক্রমে ধূমায়িত হইতেছিল। বিন্দু বিন্দু করিয়া নীড় বাঁধিবার আগ্রহ জমিতেছিল তাহার মনের কোণে। এতদিনকার চঞ্চল-বিক্ষুব্ধ জীবনের বোধহয় একটা শান্ত ভাব জাগে। অমরনাথ দিগ্বিজয়ী বীরের মত বন্ধুদের পিছনে পিছনে চলিয়াছে।

ষ্টেশনে লোক আসিয়াছিল। তাঁহারা সকলকে পাত্রীকর্ত্তার বাড়ী লইয়া গেল। যথারীতি দেখাশোনা, আলাপ আলোচনা হইল। পাত্রী পরমাসুন্দরী। অমরনাথের পছন্দ হইতে দেরী হইল না। সব ঠিকঠাক হইয়া গেল। দিন হইল ২৫শে অগ্রহায়ণ।

খুসী মনে বৈকালে তাহারা সকলে সহর বেড়াইতে বাহির হইল। বারাসত একটি ছোট সহর। রাস্তা ঘাট একরকম। বাজার হাট চলন সই। অমরনাথ গল্প করিতে করিতে সহরের একপ্রান্তে আসিয়া একটা মাঠের ধারে বসিল। মাঠের সামনে কয়েকখানি বাড়ী। আর দূরে কতকগুলি বস্তি। মাঠে একদল ছেলে ফুটবল খেলিতেছে।

ভাবী বধূ দেখিয়া অমরনাথের ইচ্ছা হইতেছিল, এই মুহূর্ত্তে তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া কলিকাতা ফিরিলে ভাল হয়। বন্ধুদেরও সেকথা প্রকারান্তরে সে কয়েকবার জানাইয়াছে। বন্ধুরা অমরনাথের কথায় মনে মনে হাসিতে লাগিল।

ফিরিবার পথে অমরনাথ দেখিল সামনের বাড়ী হইতে একটি মেয়ে যেন তাহাকে অপলকনেত্রে দেখিতেছিল। খিরকী দরজার সামনে

আসিয়া সে যেন তাহাকে একমনে দেখিতেছিল। পরণে রঙীন শাড়ী গায়ে সৌখীন ব্লাউজ অস্পষ্টভাবে অমরনাথের চোখে পড়িল। বেশভূষার যেন বেশ পারিপাট্য দেখা যাইতেছে। অমরনাথ কাছে আসিতেই সে যেন আড়ালে সরিয়া গেল এবং দরজার ফাঁক দিয়া তাহাকে আবার ভাল ভাবেই দেখিতেছে ইহাও অমরনাথ লক্ষ্য করিল।

অমরনাথ সদলবলে আপন খেয়ালে চলিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল একবার এই অন্তঃপুরবর্ত্তিনী কুমারীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। তাহার সলজ্জ ও ঔৎসুক্যপূর্ণ চাহনি তাহার বড়ই ভাল লাগিতেছিল।

কিছুদূর যাইতেই একটি বালক অমরনাথকে ডাকিল। অমরনাথ অবাক হইয়া দেখিল পিছনের বালকটি তাহার কাছে আসিয়া বলিল—"বাবা আপনাকে একবার ডাকছেন। আমাদের বাড়ী একবার আসবেন কি এই মিনিটখানেকের জন্যে ?"

—"কি দরকার ? আমাকে কেন ? আচ্ছা চল। আমি দু'মিনিটের মধ্যে—" বলিয়া অমরনাথ বালকটির সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বালকটি গিয়া যে বাড়ীতে ঢুকিল, সেই বাড়ীর কথাই সে একবার ভাবিয়াছিল। অমরনাথ বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল তাহার সামনে চপলা আশ্চর্য্যভাবে তাহার পানে তাকাইয়া আছে। অমরনাথ থতমত খাইয়া গেল, তারপর অবাক হইয়া চপলার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া বলিতে লাগিল—"তুমি এখানে ?"

—"হ্যাঁ, এখানেই, তোমার খবর কি ? হঠাৎ এখানে কেন ?"

—"আর কেন ? তোমাদের খবর দেওয়া কি অন্যায় মনে করো ? একটা সংবাদ বা চিঠি পত্র দিয়ে আমায় সান্ত্বনা দিতে পারো না। আমি

এমনি অপদার্থ স্বামী যে স্ত্রীর কোন অনুগ্রহই সে আশা করতে পারে না। আচ্ছা মানুষ তোমরা।”

—“থাক্ সে অনেক কথা! আমি এত বড় ভুলের জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, তুমি আমায় আবার তোমার পায়ে স্থান দাও। আমি বড় দাম্ভিকা। তার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। আর না! আমার সব দোষ ক্ষমা কর, আমায় আশ্রয় দাও!—ওঃ, প্রণাম করতে ভুলে গেছলাম!” বলিয়া চপলা গলায় কাপড় দিয়া অমরনাথকে প্রণাম করিল।

অমরনাথের সমস্ত কল্পনা এক নিমেষে উড়িয়া গেল। সে চপলাকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—“তাই চল! তোমায় যখন আবার ফিরে পেলাম তখন আর তোমাকে ছেড়ে থাকবো না। আজই চল আমার সঙ্গে কলকাতা।”

—“বেশ! তাই চল, তুমি আমাকে যেখানে খুসী নিয়ে চল।”

—“আচ্ছা তবে তুমি প্রস্তুত হও। আমি এইমাত্র আসছি। তোমাকে হারিয়ে আজ যে জন্যে এখানে এসেছি সে কথা ফিরে এসে বলবো! থাক্ সব!” বলিয়া অমরনাথ চলিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে আবার সে ফিরিয়া আসিল! অমরনাথকে দেখিবার জন্য বাড়ীতে এই অল্প সময়ের মধ্যে কলরব আরম্ভ হইয়াছে। সকলে অমরনাথকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। অমরনাথের কথা শুনিয়া সকলেই চপলাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

সকলে চলিয়া গেলে অমরনাথের কাছে আসিল চপলা। একান্ত সন্নিকটে আসিয়া সে বলিতে লাগিল—“কি ভাগ্যে, তুমি আজ এখানে এসেছ নইলে আমাদের আর দেখাই হ’ত না! ভগবান আমাদের ওপর

মুখ তুলে তাকিয়েছেন! কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এতদিন পরে হঠাৎ এখানে এলে কি মনে ক'রে?"

—"আর সে কথা শুনে তোমার কাজ নাই। সে তোমার পক্ষে দুঃসংবাদ আর কি? আচ্ছা শোন তবে? আমি এসেছিলাম বউ দেখতে। নিজেরই?"

—"সেতো ভাল কথা! আমি তোমায় এতদিন অশান্তির আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে রেখেছিলাম তো?"

—"আচ্ছা আমি না হয় তুমি ম'রে গেছ জেনে বিয়ে করতে চাইছি, কিন্তু তোমার মাথায় সিঁদুর কই?"

—"আমি জানি তুমি চলে গেছ! দেশে সংবাদ এল তুমি নেই, তাই আমার এই দশা!" চপলা চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

—"আমিও সংবাদ পেয়েছিলাম ঠিক ঐ রকম!"

—"যাক্, কবে যাচ্ছ বল?"

—"আজকেই ঐ বন্ধুদের সঙ্গে একট্রেনে। ওরা নিশ্চয়ই আমার অপেক্ষায় ষ্টেশনে থাকবে। কিন্তু ওরা জানে না তোমার কথা।"

—"বেশ,—একটাকে দেখতে এসে আর একটাকে নিয়ে চল্লে তাতে তাঁরা আশ্চর্য্য হবেন নাতো?"

—"সেতো হবেই! তারাও জানে তুমি মরে গেছ।"

—"সেই ছিল ভাল।"

—"যাও। প্রস্তুত হ'য়ে নাও! ভেতরে যাও।"

ট্রেণ চলিয়াছে কলিকাতা মুখে।

অমরনাথ ও চপলা মুখোমুখী বসিয়াছে। বন্ধুরা বসিয়াছে একধারে।

অমরনাথ চুপি চুপি চপলাকে বলিল—"আচ্ছা শোনতো, একটা কথা শুনলাম সেটা কি সত্যি?"

মুখ নীচু করিয়া চপলা কেবলমাত্র বলিল—"হুঁ।"

—"তবে ওখানে সে কথা বললে না কেন? ভাবী বর হয়তো তোমার ধ্যানে এখনও মগ্ন আছে! দিনটা কবে হ'য়েছিল?"

—"যাওঃ! যত সব অলুক্ষনে কথা!"

—"তার আর কি? তোমারও তো মত ছিল! আর বিধবা বিবাহ এখনতো অচল নয়। আর তাছাড়া তোমার বিয়ের অল্পদিন পরেইতো আমাদের দুজনেরই মৃত্যু-সংবাদ রটে।"

—"খুব হয়েছে যাও! সবাই এখুনি শুনতে পাবে। তোমার আর কি?"

চপলার মুখের উপর কয়েকটি চুল আসিয়া পড়াতে সেগুলি সরাইয়া দিয়া সিঁথিতে হাত দিতেই সে চমকাইয়া উঠিল। অনেকদিন পরে তাহার আবার মাথায় সিন্দুর পরিয়াছে। যে কেহ দেখিলে মনে করিবে নূতন বউ চলিয়াছে তাই মাথায় নূতন সিন্দুরের চিহ্ন।

অমরনাথ বলিল—"কোথায় থাকবে? কলকাতায় না সেই পাড়াগাঁয়ে?"

—"যেখানে তোমার খুসি, আর পাড়াগাঁয়ের ওপর আমার ঘেন্না নাই।"

—"বেশ, চল আজ কলকাতায়; কাল দেশে। দেশের বাড়ীতে যেমন ক'রে সেবার বিয়ে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম, এবারও ঠিক তেমনিভাবে নিয়ে যাব, কেমন? নতুন বউতো?"

জীবন-মৃত্যু

জীবন-মৃত্যু লইয়া যাহারা খেলা করে এ প্রসঙ্গ তাহাদের কাছে অভিনব নয়। অমরনাথ ও চপলার ঘটনায় ইন্দ্রাণী গ্রামে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে। মরণের পর নব-জীবনের অভিনব আবির্ভাবে সকলেই ভগবানের কারুণ্যকে ধন্যবাদ জানায়।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে মিলনের সুখ সত্যই প্রীতিপ্রদ ও কল্যাণজনক। অমরনাথ চপলাকে লইয়া কলিকাতায় বাসা বাঁধিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার চাকুরী খুব বেশী দিন চলে নাই। সদ্যজাত অবিনাশকে সঙ্গে লইয়া অমরনাথ গ্রামে গিয়া কিছু জমিজমা কিনিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অমরনাথের বয়স হইয়াছে। কলিকাতায় চাকুরি করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন সে করিয়াছে তাহা লইয়া এখন দেশে বাস করিতেছে। তাহার একমাত্র পুত্র অবিনাশ লেখাপড়া শিখিয়া ঢাকায় নূতন চাকুরী পাইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি তাহার বিবাহ দিয়াছেন। অমরনাথ এতদিন বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কাটিতেছিল, হঠাৎ এক বিপদ আসিয়া তাহাকে মুহ্যমান করিয়া দিল।

গ্রামে গুজব যে গিরিরাণী মারা গিয়াছে। দামোদর নদীতে স্নানের সময় কি করিয়া হঠাৎ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া সে মারা গিয়াছে, ইহা মোটেই অবিশ্বাসের কারণ নয়। গিরিরাণীর স্বামী অবিনাশ স্ত্রীর আকস্মিক ও অপমৃত্যুজনিত বিয়োগে বিশেষ দুঃখিত নয়, গ্রামের মধ্যে ইহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা চলে। ব্যাপার হইল এই যে, অবিনাশের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার বাপ প্রচুর গহনা ও যৌতুকের লোভে আকৃষ্ট হইয়া এক কুরূপা ধনী-নন্দিনীর সঙ্গে বিবাহ দেন।

অবিনাশ যখন কলিকাতায় এম-এ পড়িতেছিল, সেই সময়কার ঘটনা।—'পিতা মৃত্যুশয্যায়, সত্বর চলিয়া এসো।' টেলিগ্রাম পাইয়া অবিনাশ যখন হন্তদন্ত হইয়া বাড়ী পৌঁছিল, তখন পিতার হাসিমুখ তাহাকে স্তম্ভিত না করিয়া ছাড়িল না। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তাহাকে সেই অবস্থায় বিবাহ করিতে হইল। অবশ্য পাত্রীর কথা

তাহার অজানা ছিল। বিবাহের পর হইতে তাহার স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞার ভাব ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে। পাছে এ কথা তাহার বাপমা'র কাণে যায়, এজন্য সে অত্যন্ত গোপন করিয়া রাখিত। পিতৃভক্ত সন্তান কিনা? তাই!

বিবাহের প্রায় তিন বৎসর পরে গিরিরাণীর মৃত্যু সংবাদ রটে। ইহার মধ্যে অবিনাশ পড়া শেষ করিয়া চাকুরী লয় এবং যথারীতি প্রতি মাসে দুইখানা করিয়া স্ত্রীকে পত্র দিত ও দুই চারি মাস অন্তর বাড়ী আসিত। অবশ্য চিঠির মধ্যে মাত্র তিন চারি লাইনের বেশী কোন কথা থাকিত না। বাপমা'র ধারণা, অবিনাশের আর স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞার ভাব নাই। দুজনের মধ্যে বেশ মনের মিল হইয়াছে। বোধহয় পরে তাহারা বেশ সুখীই হইবে।

ধনী-নন্দিনী গিরিরাণী স্বামীর অবজ্ঞা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। সে এখন বুঝিতে পারিতেছে, স্বামীর অপ্রীতিভাজন হইয়া থাকা চিরকাল চলে না। স্বামীর ভালবাসা-হারা হইয়া জীবন কাটান তাহার পক্ষে এখন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। ভালয় ভালয় এখন হইতে ভগবানের আশ্রয় না লইলে, দুইটী কোরক বিয়োগ ব্যথায় শুকাইয়া যাইবে। অবিনাশ একদিন প্রকারান্তরে জানাইয়া দিয়াছে যে, সে থাকিতে তাহার জীবন সুখকর হইবে না। হয়তো, এ দুঃখে সে হঠাৎ মরিতেও পারে। তবে সে যদি এখন যায়, তাহা হইলে আবার সে নবজীবন পাইবার চেষ্টা করিতে পারে। অবশ্য জীবন সুখকর হইবে এবং এতদিন ধরিয়া সে যাহা ভাবিয়া আসিয়াছে তাহা সফল হইবে অর্থাৎ তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।......

জীবন-মৃত্যু

গিরিরাণী অত্যন্ত জেদি মেয়ে। তাহারও জিদ চাপিয়া গিয়াছে, যেমন করিয়া হোক্ স্বামী-সোহাগিনী সে হইবেই। কিন্তু বহু সাধ্য সাধনা ও বহু উপদেশেও যখন জানিতে পারিল, তাহার স্বামী কেবল সুন্দরেরই উপাসক। হীনপ্রবৃত্তি দাম্ভিক ও যেকোন প্রকার মেয়েকে বিবাহ করিয়া স্ববশে আনিতে পারে এমন ক্ষমতা তাহার আছে। কাজেই অপরূপ সুন্দরী মেয়ে না হইলে সে কিছুতেই সুখী হইবে না। অবশ্য গিরিরাণীর বিয়োগের পর সে তাহার স্মৃতির জন্য বহুস্থানে মন্দির, অতিথিশালা করাইতে প্রস্তুত বরং ভাবী স্ত্রীর জন্য সে কোথাও কোন স্মৃতি রাখিয়া যাইবে না। তাহাকে উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে এবং গিরিরাণীর স্মৃতি তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে।……

এ কথার পর গিরিরাণীকে দিন কয়েক খুব গম্ভীর দেখা গেল। অবশেষে স্থির করিল, সে তাহার স্বামীকে একবার ভাল করিয়া পরখ করিয়া লইবে। নিজের জীবন ব্যর্থ হইলেও সে স্বামীর মঙ্গল চায়; যাহাতে তাহার স্বামী চিরসুখী হয়, সে কাজ করা অন্যায় নয়। শোভনীয়।……

সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অবিনাশের জীবনে এক নূতন আলোক দেখা দিয়াছে। পত্নী বিয়োগের ছয় মাসের মধ্যে অবিনাশের আবার বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য দ্বিতীয় পত্নী অপরূপ সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং ধনীর কন্যা।

সবদিক্ দিয়া সুশোভন হইয়াছে অবিনাশের। শেফালীকে লইয়া অবিনাশ মনের আনন্দেই দিন কাটাইতে লাগিল। এম-এ পাশ করার

পর যে চাকুরীতে সে ঢুকিয়াছে তাহার উন্নতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। কলিকাতার বালীগঞ্জ অঞ্চলে বাসা লইয়া শেফালীকে লইয়া সে নির্ব্বিঘ্নে ঘর সংসার করিতেছে। বাপ ও মা দেশ হইতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার কাছে থাকেন।

জীবনের দ্বিতীয় অঙ্কে অবিনাশ নবপরিকল্পনায় নীড় সংগ্রহে ব্যস্ত। অফিস হইতে আসিয়া প্রত্যহ বৈকালে শেফালীকে সঙ্গে লইয়া মোটরে চড়িয়া বেড়াইয়া না আসিলে তাহার চলে না। পর পর দুইটী ছেলে ও একটী মেয়ে হইয়াছে। ভরা আনন্দের হাটে অবিনাশকে পায় কে?

শেফালী মধ্যে মধ্যে তাহার সতীনের কথা তোলে। অবিনাশ তাহার প্রসঙ্গ চাপা দিবার চেষ্টা করে। মনে মনে সে সর্ব্বদাই গিরিরাণীর কথাই ভাবে। নদীতে ডুবিয়া যাওয়া যে তাহার ইচ্ছাকৃত ইহা নিঃসন্দেহ। স্বামীকে ভবিষ্যতে সুখী করিবার জন্যই সে মরিয়াছে, কাজেই তাহার স্মৃতি সে চিরকালই বহিয়া চলিবে। অথচ জীবিত কালে তাহাকে বিন্দুমাত্র করুণা দেখায় নাই।

শেফালী অনুযোগ করে। প্রশ্ন করে—"কেন তুমি তাকে ভুলে যাও? আমি ম'লে নিশ্চয়ই আমাকেও ভুলে গিয়ে আবার অন্যকে বিয়ে করবে এইতো? তা বাপু, পুরুষ মানুষ তোমরা, এ আর বিচিত্র কি?"

অবিনাশ বলে—"তাকে ভুলি নাই। যদি ভুলেই যাই, সে তোমার জন্যেই। তোমার ঐ রূপ আমাকে সব সময় মুগ্ধ করে রেখেছে। তাকে আমি খুবই ভালবাসি, কিন্তু তাকে চাই না।"

—"তাহ'লে আমাকে চাও, ভালবাস না?

—"কেন ভালবাসব না? তোমাকে ভালওবাসি, চাইও!" অবিনাশ

শেফালীকে বুকে জড়াইয়া ধরে। তাহার পিঠে, মুখে হাত বুলাইয়া দেয়, আর শেফালী আবেশে অবিনাশের গায়ে ঢলিয়া পড়ে।

শেফালীর প্রথম প্রথম সন্দেহ হইত, সত্যই কি অবিনাশ তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু বিগত স্ত্রীর স্মৃতি কি সে ভোলে নাই। কিন্তু মৃতদারের সঙ্গে যাহারই বিবাহ হয় সেই ভাবে, হয়তো তাহার স্বামী বিগত স্ত্রীর বিরহে কাতর। তাহাকে হয়তো এমনভাবে ভালবাসিয়াছে, তাহার সঙ্গে এমনভাবে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া নিঃশেষ করিয়াছে যাহার তুলনা হয় না। সে ভুল আর নাই। তাহার বিশ্বাস এখন সেই তাহার সর্ব্বস্ব। শেফালী ছাড়া আর তাহার কেহই নাই।

এমনি করিয়া আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। অবিনাশের সংসার বেশ বড়ই হইয়াছে। ছেলেমেয়ে, চাকর চাকরাণী, ড্রাইভার, দ্বারোয়ান, আত্মীয় স্বজনে সে জড়ীভূত। এই রকম সুখী সংসার গড়িতে তাহার বহুদিনের আশা। নিজে বহু টাকা রোজগার করিতেছে। বিলাস-ব্যসনের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য সামান্য দানও অবিনাশকে করিতে হয়।

অবিনাশ বিভিন্ন সভাসমিতিতে সস্ত্রীক যাতায়াত করে। এ বৎসর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে সে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। শেফালীকে পাইয়া তাহার কোন অভাব অপূর্ণ থাকে না। মনে মনে গিরিরাণীর স্মৃতি তাহাকে এ বিষয়ে আরও উৎসাহ দেয়।

সম্প্রতি কাশীতে বেড়াইতে গিয়া এক আশ্রমের সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটে। সেই সূত্রে হউক বা ইচ্ছাকৃত হউক সে তাহার কর্ত্তৃপক্ষকে কয়েক হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে। পুরাতন বাড়ী

ভাঙ্গিয়া তাহার উপর নূতন একটী মন্দির ও সেই সংলগ্ন বাগানবাড়ী করাই তাহার ইচ্ছা।

অল্প দিনের মধ্যে মন্দির, বাড়ী, বাগান ও আশ্রমের যাহা যাহা দরকার করা হইল। আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে আশ্রমের নামকরণ হইল "গিরিরাণী আশ্রম"। এই নামকরণে শেফালীর আগ্রহই বেশী দেখা যায়।

আশ্রমের নবসংস্করণে শেফালী এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার ইচ্ছা সব সময়ই এখানে কাটান; কিন্তু অবিনাশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহা হইয়া উঠিত না। কিন্তু সময় ও সুযোগ পাইলেই শেফালী স্বামীকে লইয়া আশ্রমে বেড়াইতে আসিত। কখন স্বামীর সঙ্গে কখনও একলা কাশীর আশ্রমে গিয়া দিন কয়েক কাটাইয়া আসিত।

আশ্রমের পাশেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ী। সেটার বিভিন্ন মহলায় বহু লোক বাস করে। সকলেই ভাড়াটিয়া। অধিকাংশই শেষ বয়সে কাশীতীর্থে জীবন কাটাইবার জন্য আসিয়া এই বাড়ীতে একখানি বা একাধিক ঘরভাড়া লইয়া বাস করিতেছে। গঙ্গাস্নান, দেবদেবীর দর্শন, পূজা আহ্নিক লইয়াই তাহাদের দিন কাটে।

সেই বাড়ীতে শেফালীর দেশের একজন মহিলা আসিয়া বাস করিতেছেন। বাড়ী হইতে তাঁহার মাসহারা আসে। ইহাতেই তাঁহার বৈধব্য জীবন বেশ কাটিয়া যায়।

প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া বাসা ফিরিবার পথে মন্দিরে দেবী দর্শন করিয়া তিনি যেন অবশ্যই যান, ইহাই ছিল শেফালীর বিশেষ অনুরোধ।

যখন শেফালী আশ্রমে আসিত তখন শেফালীর কাছে বৃদ্ধা প্রায় সময়ই থাকিতেন।

একদিন বৃদ্ধা সকাল সকাল স্নান সারিয়া বাসায় ফিরিয়া দেখেন তাঁহার পাশের ঘরে নূতন এক অতিথি আসিয়া জুটিয়াছে। অল্প পরিচয়ে দুইজনের মধ্যে বেশ ভাব জমিয়া গেল। বৃদ্ধার দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর বহু প্রশংসা করিয়া নবাগতা মহিলাটী বৃদ্ধাকে তাহার আপনার করিয়া লইল।

প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার পথে "গিরিরাণী আশ্রমে" দেবীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া গল্প করিতে করিতে বাসায় আসিত। এমনি করিয়াই তাঁহারা কাশীবাস করিতে লাগিলেন।

শেফালী এবার একা আসিয়াছে। দুই তিন দিন হইল বৃদ্ধা আত্মীয়া আশ্রমে আসিতেছেন না কেন জানিবার জন্য নিজেই একদিন তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইল।

দেখিলেন বৃদ্ধা রোগ শয্যায়, শরীর এই কয়দিনের মধ্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। শেফালীকে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধা আত্মীয়াকে দেখিবার জন্য শেফালীর আগ্রহ তাঁহাকে মুগ্ধা না করিয়া পারে না।

পাশের সেবারতা মহিলাটীর অজস্র প্রশংসা করিতে করিতে শেফালীর সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

শেফালী মহিলাটীর পরিচয় লইয়া জানিতে পারিল তাহার স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। সংসারে আর কেহই নাই। এক দূর সম্পর্কের ভাই তাহাকে মাসে মাসে কিছু টাকা করিয়া সাহায্য পাঠায়।

তাহাতেই তাহাকে কোন প্রকারে দিন কাটাইতে হয়। ইচ্ছা আছে শেষ-জীবন কোন তীর্থক্ষেত্রে কাটাইয়া দেওয়া। আর ভাগ্যে যদি স্বামীদর্শন ঘটে তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ ধরিবেন।

শেফালী মহিলাটীর দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিতা হইল। স্বামীহারা নিরাশ্রয়া নারী হয়তো সব সময়ই তাহার স্বামীর সঙ্গলাভের আশায় উৎকণ্ঠিতা হইয়া প্রত্যেক সন্ন্যাসীকেই বিশেষ লক্ষ্য করে, ভাবে যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়!

নানা প্রসঙ্গের মধ্যে শেফালীর সাংসারিক সমস্ত সংবাদ মহিলাটী জানিয়া লইল।

শেফালী তাহার স্বামীর নাম করিয়া তাহাকে আশ্বাস দেয়। ইচ্ছা করিলে তাহার স্বামীর আশ্রমে সে থাকিতেও পারে জানায়।

মহিলাটী শেফালীর স্বামীকে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলে—"তিনি মহাপুরুষ, তাঁর আশ্রমে থাক্‌ব তার আর কথা কি? যেদিন খুসী সেদিন হ'তে থাকতে পারি।"

শেফালী আশ্রমের ইতিহাস জানায়ঃ প্রথমপক্ষের স্ত্রীর নামে উৎসর্গীকৃত আশ্রম, স্বামী বহুটাকা রোজগার করেন। এই রকম আরও অনেক বিষয়ে তিনি বহুটাকা দান করেছেন।

মহিলাটী আনন্দ জানায়। গিরিরাণীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তিনি মরিয়াও আমাদের কাছে অমর এ কথা জানায়।

গিরিরাণীর প্রসঙ্গ নানা কথার মধ্যে যতদূর পারে জানিয়া লয়। আর কারণে অকারণে কাহার উদ্দেশ্যে যেন প্রণতি জানায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই অসুখেই শেফালীর আত্মীয়াটী মারা যান। আত্মীয়ার সৎগতি স্বয়ং শেফালী সাধ্যমত করিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। যাইবার সময় মহিলাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গেল, তিনি যেন প্রত্যহ "গিরিরাণী আশ্রমে" দর্শন দেন।

অল্প কয়দিনের আলাপে শেফালী তাহাকে একজন পরমাত্মীয়ার মত পাইল। মহিলার ব্যবহারে শেফালী এতই মুগ্ধা হইয়াছিল যে তাহাদের সংসারের সমস্ত কথাই তাহাকে বলিত, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয় ভালবাসার কথাও উল্লেখ করিয়া পুরাণো যৌবন-স্মৃতি জাগাইয়া দিত।

কলিকাতায় দিন কয়েক থাকিয়া কাহার টানে হঠাৎ শেফালী আবার কাশী আসিল। এবার শেফালী মহিলাটীর বাসায় নিজে আসিয়া দেখা দিল এবং কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে কথা পাড়িল যাহাতে মহিলাটী না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। আদর নাই, আপ্যায়ন নাই হঠাৎ আসিয়া তাহার কাছে চুপটী করিয়া বসিয়া এমনভাবে কথা পাড়িল যেন বহুদিনের পুরাণো বন্ধু কালকের সমাপ্ত গোপন কথাটী শেষ করিবার জন্য আসিয়াছে।

—"দিদি, তোমার জন্যে আমার মন এমন ছটফট করে কেন বলতো? তোমার জন্যেই আমার আর সেখানে থাকা হ'ল না। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এখানে আবার চ'লে এলাম। তিনি হয়তো এতে আমার ওপর খুবই চটেছেন।"

—"এ বড় অন্যায় কথা বোন, আমি কে না কে, আমার টানে স্বামীর সঙ্গে চটাচটি ক'রে কেন এলে বলতো ?"

—"তা জানি না, তোমায় আমার বড্ড ভাল লাগে দিদি, তাই ছুটে চলে এলাম। কালই আবার ফিরে যাব! তুমি আমার সঙ্গে সেখানে যাবে ?"

—"না, না, আমি বেশ আছি। যদি আত্মীয় স্বজনের কাছে থাকতে ভাল লাগত তা'হলে এখানে আশা কেন বোন ?"

—"তা জানি, তাহোক চল দিদি, তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাই! তাঁকে তোমার কথা জানিয়েছি। তুমি ওখানে গেলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। তোমার কথা সব শুনে তিনি খুব দুঃখিত। তাঁর ইচ্ছা, তোমার বাসনা অপূর্ণ থাকবে না। স্বামীদর্শন হবেই। চল দিদি, সেই ভাল, আমরা দুই বোনে এক সঙ্গে বেশ থাকব। মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে এমন কি তোমার জন্যে দেশে দেশেও ঘুরবো! তাই চল দিদি। তা'হলে আমি কিযে খুসী হবো তা আর বলা যায় না।"

—"আচ্ছা, বসো কাপড়খানা বোধহয় শুকিয়েছে, নিয়ে আসি ভাই!" বলিয়া মহিলাটী বারান্দায় কাপড় আনিতে গেল। শাড়ীখানি আনিয়া আলনায় রাখিতে রাখিতে উদাসভাবে এমন কয়টি কথা জানাইল, যাহার অর্থ অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়।

—"পরের বাড়ী যাওয়া পছন্দ হয় না ? আমি তাহলে পর কি বলো দিদি ?"

—"না বোন, তুমি পর একথা কি আমি বলতে পারি! আমার বড় ভাগ্য তাই তোমার মত বোন পেয়েছি। তুমি সুখী হও! আশীর্ব্বাদ

করি স্বামী আদরিণী হ'য়ে চিরকাল আনন্দে কাটাও। আমার মত হতভাগিনীর সংস্পর্শে এলে, হয়তো তোমাদের অকল্যাণ হতে পারে!"

—"কি বল দিদি, তোমার মত সতী সাধ্বীর পায়ের ধূলো পেলে আমরা ধন্য হয়ে যাব।" বলিয়া শেফালী তাহার পায়ের ধূলা লইল।

সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া মহিলাটী উঠিয়া দাঁড়াইল। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আর তোমার সঙ্গে একদিনও মিশ্‌বো না। তোমরা আমাকে কেবল কাঁদাতে এস!" বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শেফালী অপ্রস্তুত হইয়া গেল। ক্ষমা চাহিয়া জানাইল যে, আজ বিকালে তার আশ্রমে যেন নিশ্চয়ই যাওয়া হয়। তারপর চলিয়া গেল।

ইহার পর তিন চারি দিন মহিলার কোন সংবাদ নাই। প্রত্যহ সকালে যে আশ্রমে আসে, এ কয়দিন তাহার না আসার কারণ কি? অগত্যা শেফালীকে তাহার বাসায় যাইতে হইল।

শেফালী দেখিল এই কয়দিনে মহিলার মুখের অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

শেফালী ঘরে ঢুকিবামাত্র মহিলাটী যেন অবজ্ঞাভরে জানাইল—"কেন তুমি এখানে এসেছ।"

—"দিদি, মন আর থাকে না। তোমার জন্যে দিনরাত ছটফট করছিলাম। কেন আসছিলে না, জ্বর টর হয়েছিল নাকি?"

—"শরীর ভাল নাই। আর বোধহয় বাঁচবো না।"

—"সে কি কথা, ও কথা বলতে নেই দিদি!"

—"তাই ঠিক্! কাল এস, কয়েকটা কথা বলে যাব।"

জীবন-মৃত্যু

—"কোথায় যাচ্ছ নাকি ?"

—"না, না, কাল এসো বলব ? এখন একবার বেড়ুবো। তুমি বরং যাও।"

—"আচ্ছা" বলিয়া শেফালী বিমর্ষভাবে উঠিল। তাহার মনের মধ্যে তখন নানাকথা চলাফেরা করিতেছিল।

কাল আসিবে বলিয়া শেফালীর চারি পাঁচ দিন দেখা নাই। অবিনাশ আর থাকিতে পারিল না। কাশী আসিয়া হাজির। অবিনাশ আসিলে শেফালী তাহাকে মহিলাটীর কথা বিশেষ জোর দিয়া বলিতে লাগিল। অগত্যা একদিন মহিলাটীকে দেখিতে যাইবে বলিয়া সে কথা দিল।

শেফালীর এবার আশা হইয়াছে যে, স্বামী স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া তাহাকে একরূপ জোর করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাইবে। তাই আর বেশী দেরী না করিয়া পরদিন সকাল বেলায় তাহার বাসায় হাজির। বাসায় গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে শেফালী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। ভাবে বুঝিল, এই তিন দিন ধরিয়া মহিলাটী কিছু খায় নাই, ঘুমায় নাই, কেবল কাঁদিতেছে। কেন, কি জন্য তাহার উত্তর নাই।

শেফালীকে দেখিয়াও সে যেন কোন কথা বলিল না। আপন-মনে ঘর ও বারান্দায় কেবল পায়চারী করিতেছে। শেফালী বিশেষ দুঃখিত হইল। কিছুক্ষণ তাহার ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া সন্দেহ হইল, হয়তো তাহার মাথার দোষ দেখা দিয়াছে। হতভাগিনী, স্বামীহারা, নিরাশ্রয়া নারীর এ কি দশা !

শেফালী তাহার কাছে ঘরে গেল। সে ঘর হইতে বারান্দায় আসিল,

শেফালী বারান্দায় গেল, সে ঘরে ঢুকিল। দুই তিনবার এমনি করিয়া শেফালী আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দুই হাত ধরিয়া অনুযোগের সুরে বলিল—"দিদি, এ তোমার কি হ'ল ? এমন কর্চ্ছ কেন ? কি হ'য়েছে বল না ?"

শেফালীর হাতখানা ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া দিয়া মহিলাটী বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখদুটি জবাফুলের মত লাল। মুখ দিয়া অনবরত অস্ফুট ধ্বনি উঠিতেছে। গায়ের ও পরনের কাপড়ের অবস্থা অসংবৃত।

শেফালী আবার তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল—"দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, বলনা তোমার কি হ'য়েছে ? আমি সেদিন তোমায় ওসব কথা বলেছি তাই আমার ওপর চটেছ, আর বলব না আমায় ক্ষমা কর ! তোমায় দেখলে আমার কেমন ভয় করছে ! এমন করছ কেন ? কি হয়েছে বলনা, দিদি ?" বলিয়া তাহার হাত দুইখানি আবার চাপিয়া ধরিল।

এবারও মহিলাটী তাহার হাতখানি সজোরে ছিনাইয়া লইয়া কেবল বলিতে লাগিল—"জানিনা, জানিনা, তোমরা কেন আমার কাছে এসো ? আর এসোনা ? তোমাদের দেখলে আমার শরীর জ্বলে যায়।" তারপর কপালে হাত দিয়া অস্ফুটে বলিতে লাগিল—"আর আমি বাঁচব না, আমি মরে যাব ! আমি মরে যাব !"

শেফালী এবার তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"কেন মরবে ? মরতে আমি দোবোনা ! তোমার কি হয়েছে বল ? তোমার জন্যে সর্ব্বস্ব দেব ! তুমি একবার বল, কি হয়েছে ! আমার স্বামী কাল

এসেছেন। তিনি যখন এসে পড়েছেন তখন সাধ্য কি তোমার অমঙ্গল হয়। তোমার জন্যে আমরা সর্ব্বস্ব খোয়াবো, তোমাকে বাঁচাবোই বাঁচাবো! বল দিদি বল, কি হয়েছে। কে তোমার কি করেছে?"……

শেফালীকে ধাক্কা দিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল—"কে আবার কি করবে, তুমি, তুমি, তুমিই আমার সর্ব্বনাশের মূল! তুমি আমার কাছ হ'তে দূর হয়ে যাও! আর যদি কখনও এসোতো আমি আত্মহত্যা করব? সর্ব্বনাশী! দূর হয়ে যা! তোর মুখ দেখতে চাই না!"

শেফালী উঠিয়া দাঁড়াইল। কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল—"আচ্ছা আমি ওঁকে ডেকে নিয়ে আসি।"…

অবিনাশকে সঙ্গে আনিয়া শেফালী সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিল। তারপর ঘরে গেল। এদিক ওদিক চাহিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। দুইজনেই নির্ব্বাক্! নিস্তব্ধ!

শেষে অনুমান করিল হয়তো কোথাও গিয়াছে। একটু পরে নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু তিন চারি ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়াও যখন সে আসিল না, তখন অগত্যা আবার খোঁজ লইবে বলিয়া তাহারা আশ্রমে চলিয়া গেল।

সাতদিন মহিলাটীর কোন খোঁজ মিলিল না দেখিয়া অবিনাশ শেফালীকে লইয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। তাহারা অনুমান করিল, হয় সে কোথাও চলিয়া গিয়াছে, কিম্বা পাগল হইয়া গিয়াছে। নইলে আর বাসায় ফেরে না কেন?……মরে নাইতো? তাহা হইতেও পারে, মরণের কথাতো সে প্রায়ই বলিত; শেফালী মধ্যে মধ্যে স্বামীকে ইহা শোনাইত।

ছয়মাস পরে আবার শেফালী কাশী আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সে

আশ্রমের লোক মারফৎ সংবাদ পাইত যে, এখনও মহিলাটী ফেরে নাই। আদেশ ছিল, তাহার খোঁজ পাইলে যেন আট্‌কাইয়া রাখে এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেওয়া হয়।

একদিন শেফালী সংবাদ পাইল, শ্মশানের ধারে এক বৃদ্ধা মহিলা উন্মত্ত অবস্থায় ঘোরা ফেরা করিতেছে। সংবাদ পাইবামাত্র শেফালী ছুটিল, কিন্তু বৃদ্ধা বলায় তাহার যেন সন্দেহ জাগিতেছিল। যাহা হউক, শ্মশানের কাছে গিয়া দেখিল বৃদ্ধাই সেই মহিলা। তবে উন্মত্ত অবস্থায় নাই। অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ছয় মাসের মধ্যে তাহার বয়স দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। মাথার চুল একটীও কাঁচা নাই। কপালের সিন্দুরের কোন চিহ্নই নাই। মুখে বহু শীর্ণ রেখা ও শরীর কঙ্কালসার হইয়াছে। এমন অবস্থায় আছে, যেন মনে হয় আর দুই ঘণ্টাও সে বাঁচিবে না।

শেফালী তাহাকে আর কোন কিছু বলিল না। লোক দিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে আশ্রমে পাঠান হইল। শেফালী সঙ্গে থাকিয়া তাহার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিল।

আশ্রমে আনিয়া তাহাকে একখানি চৌকির উপর শোয়ান হইল। গরম দুগ্ধ দেওয়া হইল। ময়লা কাপড়খানির বদলে ধোয়া কাপড় একখানি দেওয়া হইল। ডাক্তার ডাকা হইল, যাহাতে অবিলম্বে সে সুস্থ হয়।

বৃদ্ধা মহিলাটীকে একটু পরে যেন সুস্থ দেখা গেল। সে চোখ মেলিয়া চাহিল। বৃদ্ধা চাহিতেই শেফালী কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"দিদি, এমনি ক'রে আমাদের কষ্ট দেওয়া কি ঠিক হয়েছে? আমরা তোমার জন্যে পাগলের মত হয়ে পড়েছি!"

বৃদ্ধা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"কেন

তোরা আমায় এখানে আনলি। শ্মশানেই মরা আমার কাম্য! তোরা আমায় সেখানে রেখে দিয়ে আয়!" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেফালীকে আস্তে আস্তে বলিল—"তোর স্বামী কোথায়, হতচ্ছাড়ি?"

শেফালী ব্যস্ত হইয়া বলিল—"তাঁকে এইমাত্র টেলিগ্রাম করছি। তুমি ব্যস্ত হয়ো না দিদি? কি খাবে এখন বল?" একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শেফালী বৃদ্ধাকে তাহার সম্বন্ধে তাহাদের দুইজনের উৎকণ্ঠিত অবস্থার কথা জানাইল।

বৃদ্ধা টেলিগ্রামের কথায় আর একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিল। শেফালীকে আরও কাছে আসিতে বলিয়া ঈঙ্গিতে সকলকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিল।

শেফালীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বৃদ্ধা আস্তে আস্তে জানাইল, তাহার এখন শেষ অবস্থা। শত চেষ্টা করিলেও সে আর বাঁচিবে না, তাহার আর বাঁচিয়া থাকার উপায়ও নাই। তবে শেষ সময়ে তাহাকে একটি অতি বড় গোপনীয় কথা জানাইয়া দিবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইবে যেন একথা আর কাহাকেও সে না জানায়।

শেফালী সম্মত হইলে বৃদ্ধা তাহাকে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী শুনাইল। কেমন করিয়া অবিনাশের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। অবিনাশকে বহু অনুনয় বিনয় করিয়াও যখন তাঁহার ভালবাসার এক কণাও সে পাইল না, সে না মরিলে তাহার স্বামী সুখী হইবে না; তখন অগত্যা একদিন নদীতে স্নান করিতে আসিয়া ঘাটে ঘড়া রাখিয়া সে নিরুদ্দেশ হয়। ইচ্ছা, তাহার স্বামী ভবিষ্যতে সুখী হন কিনা ও তাহার স্মৃতি তাঁহার মনে থাকে কিনা! এখন তিনি সুখী হইয়াছেন জানিয়া নিশ্চিন্ত।

বৃদ্ধা হাঁফাইতেছিল দেখিয়া শেফালী তাহাকে অনুরোধ করিল—"আর ব'লতে হবে না, একটু সুস্থ হ'লে পরে আরও শুনব।"

বৃদ্ধা তাহাকে বুকের উপর জোর করিয়া টানিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"আমার স্বামী দেবতা, তোমার মত সতীসাধ্বী স্ত্রী পেয়ে নিশ্চয়ই সুখী হয়েছেন। তোমার হাতে আমার স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে আমিও সুখী হলাম। অনুরোধ, শেষ জীবনে আমার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে তাঁর চরণেই মন দেবে। আমাকে আর বাঁচাতে পারবে না! দু'এক দিনের মধ্যেই আমার সব শেষ হয়ে যাবে। তবে এক কাজ ক'রো, তোমাদের আশ্রমের এক কোণে আমার সমাধী তৈরি করে রেখো। আর আমার স্বামীকে যেন কদাচ আমার এই অসহায় অবস্থার কথা জানিও না। তাহলে তিনি অত্যন্ত ব্যথা পাবেন। ভগবান তোমার সিঁথীর সিঁদুর অটুট রাখুন।"

বৃদ্ধা আর কিছু বলিতে পারিল না; কেবল হাঁফাইতে লাগিল অবশেষে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তাহার জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শেফালী যথারীতি তাহার সৎকার করিয়া আশ্রমের আরও উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া দিল। সতীনের অকালমৃত্যুতে তাহার মর্ম্মস্থলে যে আঘাত লাগিল তাহা সামলাইতে পারিল না। শরীর ও মনের ক্ষত অবস্থা লইয়া সে কাশী ত্যাগ করিল। যাইবার সময় আশ্রমের অধ্যক্ষকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিয়া কতক নিশ্চিন্ত হইল।

শেফালী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিল না। বরং একবার দেশে গেল। পুত্র কমলকে সঙ্গে লইয়া সে এথান ওথান ঘুরিতে ভালবাসে।

গ্রীষ্মকালের দামোদর বর্ষায় অন্যরূপ ধারণ করে। তাহার উচ্ছ্বাস স্রোত ও ফেনিল আবর্ত্ত দেখিয়া সকলেই ভয় খাইয়া উঠে। বর্ষার রুদ্ররূপ দেখাইয়া নদী যেন মানুষকে উপহাস করিয়া চলে।

অপ্রত্যাশিতভাবে দুরন্ত দামোদর পার হইয়া ইন্দ্রাণী গ্রামে উপস্থিত হওয়ায় বাড়ীর সকলেই বিশেষ করিয়া শ্বশুর অমরনাথ অবাক হইয়া গেল। এজন্য শেফালীকে ভৎসনা না করিয়া পারিল না।

শেফালী আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া দিন কয়েক কাটাইল। ফিরিবার সময় অমরনাথের সঙ্গে কি কথা হইল জানা যায় নাই। তবে তাহারা কলিকাতার পথে যাত্রা না করিয়া বরাবর কাশী চলিয়া গেল। এবার কমল সঙ্গী হইল না। অমরনাথ বধূমাতার সহিত তীর্থ ভ্রমণের জন্য

রওনা হইল। বৃদ্ধবয়সে তীর্থপর্য্যটন কাহার না ভাল লাগিবে ? অমরনাথের ভালই লাগিল। প্রথমে কাশী। সেখানে দিন কয়েক কাটাইয়া আরও কয়েক স্থান ঘুরিয়া অবশেষে আবার কাশী ফিরিয়া আসিল।

কিছুদিন কাশীতে থাকিবার সময় অমরনাথ একটি অনাথ হিন্দুস্থানী বালক সংগ্রহ করে। তাহার নাম চন্দ্রনাথ। সে সব সময় অমরনাথের সেবায় নিযুক্ত থাকিত। তামাক সাজিত, হাত-পা টিপিয়া দিত এবং সদা সর্ব্বদা ফাই ফরমাস খাটিত।

কিছুদিন পরে শেফালী শ্বশুরকে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল। দামোদর নদীর ধারে যেখানে একটি কালীমন্দির বহুদিন হইতে গ্রামবাসীর অবজ্ঞেয় হইয়া আসিতেছিল তাহাকে মেরামত করিয়া তাহার নিত্যসেবার ব্যবস্থা করিয়া দিল এবং তাহার পাশে একটি আশ্রম বসাইল। দূরের কোন এক গ্রামের বিষ্ণুদাস বাবাজিকে আনিয়া সেখানকার দায়ীত্ব দিল। আশ্রমের নাম হইল "গিরিরাণী আশ্রম"। বহুদিন পরে আবার গিরিরাণীর স্মৃতি ইন্দ্রাণী গ্রামে জাগিয়া উঠিল।

এদিকে চন্দ্রনাথের বয়স বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে বেশ কর্ম্মঠ যুবক হইয়া উঠিল। শরীরের মাংসপেশী দৃঢ় ও সবল দেখা গেল। পরিশ্রমে সে কখনও বিমুখ হয় না। আলস্যে ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। অমরনাথের দক্ষিণ হস্ত হইয়া পড়িল। চন্দ্রনাথকে না হইলে তাহার এক দণ্ডও চলে না। চন্দ্রনাথ কাজ-কর্ম্ম করিয়া অবসর সময়ে আশ্রমে ও কালী বাড়ীতে সময়ে সময়ে যাতায়াত করিত। বৈষ্ণব বিষ্ণুদাস বৈরাগী ও বৈষ্ণবী মাধবীলতা চন্দ্রনাথকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিত। চন্দ্রনাথ

তামাক সাজিতে ওস্তাদ। বিষ্ণুদাস বৈরাগীর কাছে আসিলেই তাহাকে তামাক সাজিয়া আনিতে বলে। তাহার পাকা হাত দেখাইবার জন্য বিষ্ণুদাস অনুরোধ জানায়। কিছুদিন পরে চন্দ্রনাথের এমন একটা স্বভাব হইয়া গেল যে, বিষ্ণুদাসকে তাহার হাত না দেখাইলে চলে না।

বিষ্ণুদাস বলে—"কি হে চন্দ্রনাথ, কি খবর ?"

—"এই যে এলাম, আপনার তামাক সেজে দেবার জন্যে !"

—"আমার তামাক সাজবার জন্যে বাবুর কাজ ফেলে এখানে এলে ?"

—"তাঁর কাজ সেরে এসেছি !"

—"ওগো দেখ্‌ছ ?" বিষ্ণুদাস মাধবীলতাকে ডাক দেয়। বলে—"চন্দ্রনাথের আক্কেল দেখ ! আমার তামাক সাজবার জন্যে ও ছুটে আসছে মনিব বাড়ী থেকে।"

মাধবীলতা উত্তর দেয়—"তোমার ওপর ওর ভক্তির সীমা নাই। তাই সময় পেলেই ও এখানে ছুটে আসে।"

বিষ্ণুদাস হাসে। বলে—"তা বেশ, বেশ, বাবাজীর আমার ওপর যেমন ভক্তি দেখছি, তাতে তার একটা বিহিত করতেই হ'বে ; কি বল চন্দ্র বাবাজী ?"

চন্দ্রনাথ হাসে। আনন্দে ঢলিয়া পড়ে। আস্তে আস্তে আসিয়া বিষ্ণুদাসের পায়ের কাছে বসে।

বিষ্ণুদাস একটা মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছে। পরশু হইতে তাহার আরম্ভ হইবে। প্রতিবৎসর এমনি দিনে সে একটি করিয়া মহোৎসবের আয়োজন করে। এবারও তাহাই করিয়াছে।

চারিদিক হইতে বৈরাগীর দল আসিয়াছে। বুড়ো, বুড়ি, তরুণ, তরুণী ও বালক বালিকার সমাবেশে বিষ্ণুদাসের আখড়া সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। কীর্ত্তনের সুরে, বহু নরনারীর কলরবে আখড়া মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে চন্দ্রনাথ আসিয়া দেখা দিল। চন্দ্রনাথকে পাইয়া সকলে হরিবোল দিয়া উঠিল। অবশ্য এই ইঙ্গিতটা বিষ্ণুদাসের।

চন্দ্রনাথ আসিয়া চুপটি করিয়া বসিল বিষ্ণুদাসের কাছে। চারিদিকে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের আড্ডা জমিয়া উঠে। কেহ গান গায়, কেহ বাজায়, কেহ নাচে। আর চন্দ্রনাথ চুপটি করিয়া বসিয়া বসিয়া আয়তনেত্রে তাহাই দেখে।

বিষ্ণুদাস্ চন্দ্রনাথের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারে না। আভাবে জানায় চন্দ্রনাথকেও তাহাদের দলভুক্ত করিতে আর বেশী দেরী হইবে না।

চন্দ্রনাথ হাসে, কোন উত্তর দেয় না।

এমনি করিয়া কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। প্রতি বৎসরের উৎসবে চন্দ্রনাথ বৈরাগীদের মতই যোগ দেয়। কখনও গায়, কখনও বাজায়, আবার কখনও নাচে। চন্দ্রনাথের নাচিবার ভঙ্গি অদ্ভুত রকমের।

মনিববাড়ীর কাজ সারিয়া যে সময়টুকু চন্দ্রনাথ পাইত, তাহার একটুও অপব্যয় করিত না। বরাবর বিষ্ণুদাসের আখড়ায় আসিয়া জুটিত।

একদিন বিষ্ণুদাস অমরনাথের কাছে গিয়া চন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব তুলিল। অমরনাথের অমত দিবার কোনই কারণ নাই। তাহা ছাড়া চন্দ্রনাথকে কেহ মেয়ে দিতে চাহিত না বলিয়া আজ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই। বিষ্ণুদাসের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সম্মতি দিতে

হইল এবং কয়েক বিঘা জমি চন্দ্রনাথের নামে লিখিয়া দিবারও প্রস্তাব সে সময় করিয়া বসিল।

বিষ্ণুদাস আখড়ায় আসিয়া বৈষ্ণবীর কাছে চন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ তুলিল। —"অমরনাথবাবুর এ বিষয়ে বিশেষ মত আছে। তা ছাড়া তিনি অল্প কয়েক বিঘা জমি চন্দ্রনাথের নামে লিখে দিতে চান। কাজেই হরিমতির সঙ্গে চন্দ্রনাথের বিয়ে দিতেই হবে।"

চন্দ্রনাথ আসিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইতেই মাধবীলতা হাসিতে হাসিতে বলিল—"এই যে আসামী হাজির।" সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুদাসও হাসিয়া ফেলিল। কাছে ডাকিয়া বলিল—"কিহে, বিয়ের গন্ধে গন্ধে এলে নাকি?"

—"হ্যাঁ," বলিয়া চন্দ্রনাথ কাছে গিয়া বসিতেই দুইজনে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিয়াছে, চন্দ্রনাথ বিয়ে-পাগলা হইয়াছে।

—"তবে শোন," বলিয়া বিষ্ণুদাস মাধবীলতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"তবে আর কি? চন্দ্রনাথের বিয়ের জোগাড় কর! ওতো রাজী!"

চন্দ্রনাথ ভাবে নাই যে, তাহারা তাহারই বিবাহের জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। হাসিতে হাসিতে বলিল—"বিয়ে করার ক্ষমতা কই? আর আমাকে বিয়ে দেবেই বা কে?"

—"তার অভাব নাই! তুমি রাজীতো?"

—"না!"

—"কেন?"

—"খাওয়াবো কি ক'রে? তা ছাড়া আমার মত লক্ষ্মীছাড়াকে কে মেয়ে দেবে? আমার কি আছে? আর বাবু কি বলবেন?"

—"ও সব ভাবতে হবে না। আমরা তোমার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি দেখ

তো ! তুমি হরিমতিকে জানতো ? সেই সুন্দরী মেয়েটি ! যার পিছু পিছু তুমি সব সময়ই ঘুরতে ! তারই সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি ! তোমার বাবুর মত পেলাম।”

চন্দ্রনাথ আশা করে নাই যে, তাহার মত লোকের আবার বিবাহ হইতে পারে। কোন কুরূপা মেয়েও যে তাহার গলায় মালা দিতে পারে এ ভাগ্য সে করে নাই। সুন্দরীতো দূরের কথা ! কাজেই সে বিবাহে নারাজ।

অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিতেই হইল। সুন্দরী হরিমতীকে বিবাহ করিয়া যখন সে বিষ্ণুদাসের আখড়ায় আনিল তখনও পর্য্যন্ত সে বিশ্বাস করিতে পারিল না, সে বিবাহ করিল কি না।

তারপর অমরনাথের দয়ায় চন্দ্রনাথ হরিমতীকে লইয়া নূতন করিয়া ঘর বাঁধিল। চন্দ্রনাথ ও হরিমতী দুইজনেই মনিব বাড়ীতে কাজ করিত। তাহাতেই তাহাদের দিন বেশ কাটিতে লাগিল।

চন্দ্রনাথের ভাগ্য ফিরিয়া গেল। হরিমতীকে পাইয়া তাহার সুখের জোয়ার বহিতে লাগিল।

চন্দ্রনাথকে পাইয়া হরিমতীর হাসি আর ধরে না। এই অবুঝ বোকা লোকটিকে লইয়া সে দিন-রাত খেলা করিত। যে দিকে যখন খুসি হইত সেই মত চালাইত। মোটকথা চন্দ্রনাথকে দেখিলেই হরিমতীর হাসি পাইত। আবার হরিমতীর হাসিতে চন্দ্রনাথ যখন বোকার মত হাসিত তখন হরিমতী হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িত। চন্দ্রনাথের জন্যই যে হরিমতীর হাসি আসে অত সে বুঝিতে পারিত না। মধ্যে মধ্যে চন্দ্রনাথের পৌরুষ জাগিলে সে হরিমতীকে শাসন করিবার জন্য চেষ্টা

করিত, কিন্তু চঞ্চলা হরিমতীকে সে কোন মতে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

এমনি ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিল। চন্দ্রনাথের আখড়ায় হরিমতীর কৃপায় পাড়ার বহু ছোকরা আসিয়া দেখা দিতে লাগিল। দুই একজন বৃদ্ধলোক চন্দ্রনাথকে এবিষয়ে নিষেধ করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই।

এমন চন্দ্রনাথেরও কপাল ভাঙ্গিল। একদিন রাত্রে হরিমতীকে সাপে কামড়াইল। বহু ঝাড় ফোঁক করিয়া ঔষধ দিয়াও কিছুই হইল না। হরিমতীর অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের শত চেষ্টা বিফল করিয়া চন্দ্রনাথকে কাঁদাইয়া হরিমতী অজানা রাজ্যে চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ হতাশ হইয়া পড়িল। সে যাহা আশা করে নাই তাহাই পাইয়াছে। যাহা পাইয়াছে তাহা ভোগ করিতে না পাওয়ার দুঃখ চন্দ্রনাথ জীবনে কখনও ভুলিবে না।

বিষ্ণুদাস আবার আসিয়া সান্ত্বনা দিল। বিবাহ করিবার কথা তুলিল। অমরনাথ আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিল। শেষে বিবাহ প্রস্তাব করিয়া গেল। পাড়ার বন্ধুরা তাহাকে আবার বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে এক কথাই সকলকে বলিতে লাগিল, তাহার ভাগ্যে যে সুখ নাই, কাজেই সে আর বিবাহ করিবে না।

একেইতো চন্দ্রনাথ নিরীহ গোবেচারা। তাহার উপর পাড়ার ভদ্র ইতর সকলেই তাহাকে আবার বিবাহ করিবার জন্য ধরিয়াছে। কেহ

রাস্তায় চন্দ্রনাথকে দেখিলেই বিবাহ প্রস্তাব করিয়া বসে। ফলে তাহার রাস্তায় চলা বন্ধ হইবার উপক্রম। গ্রামের লোকেরা এতই বোকা যে, সে বিবাহ করিতে চায় না তবু তাহাকে এমন ভাবে ছাঁকিয়া ধরে কেন? চন্দ্রনাথ বলে আর হাসে।

সেদিন বিষ্ণুদাস চন্দ্রনাথকে দেখিয়া বলিল—"কি হে, তোমার খবর কি? আমার আখড়া যাওয়া ছেড়েই দিলে যে! বউ ম'রে গেল তার জন্তে ভাবনা কি? আমার ওখানে যেয়ো, আবার তোমার একটা জুটিয়ে দেবো! মেয়ের আবার ভাবনা কি?"

চন্দ্রনাথ কাঁদে। বলে—"আপনার ওখানে গিয়েই আমার এই হ'ল। আমার ভাগ্য মন্দ! আর আমি বিয়েও করব না! আপনার ওখানে যাবও না!"

—"না, না, ও কথা ব'লো না? এক যায় এক আসে তার জন্তে ভাবনা কি? আমরা জাত বোষ্টম! আমরা এক ছাড়ি এক ধরি!"

—"দোহাই গুরুজি!"

—"তা হবে না, ওসব শুনছি না, আমার কাছে যেন যেয়ো।"

বিষ্ণুদাস চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ একদৃষ্টে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। সদ্য-ব্যথিত হৃদয় কিছুতেই শান্তি পায় না।

অমরনাথের বাড়ীতে কাজ করিয়া সে যাহা পায় তাহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট। চন্দ্রনাথের খাওয়ার ভাবনা নাই। নগদ মাহিনাটা জমে। জমির ধান গোলা ভরা থাকে। তাহার অভাব কিছুরই নাই। যে আসিত, হাত পাতিলেই কিছু না কিছু পাইত।

এদিকে বিষ্ণুদাস যাহাকে দেখিত তাহাকেই চন্দ্রনাথকে একবার

তাহার কাছে পাঠাইয়া দিতে বলিত। ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে, "চন্দ্রনাথ, তোমাকে বাবাজী ডাক্‌ছে," বলিলেই হইল অমনি সে ছুটিয়া তাহাকে তাড়া করিত।

চন্দ্রনাথের রাগ আসিয়া পড়িল বিষ্ণুদাসের উপর। সেই যত নষ্টের গোড়া। বিষ্ণুদাসের নাম করিলেই আর কাহারও রক্ষা থাকিত না!

সুযোগ সুবিধা পাইলেই পাড়ার ছেলেরা চন্দ্রনাথকে দেখিয়া বলিত—"তোমায় বৈরাগী ডাক্‌ছে!" কেহ বা বলিত—"এখনও বৈরাগীর কাছে যাও নাই?"

কেহ হয়ত চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গেছলে? বা চললে কোথায়?" অমনি পাশ হইতে কেহ বলিয়া উঠিত—"বৈরাগীর আখড়ায়!"

বেচারা চন্দ্রনাথ নাচার! এমন ভৃত্যকে লইয়া এই সময়ে রসিকতা করা কি সঙ্গত? কিন্তু সে কথা বলে কে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দামোদর নদীর তীরে ইন্দ্রাণী গ্রামখানি এখন যেন বেশ বড় হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অন্যান্য প্রায় সব জাতিই বাস করে। ইহা ছাড়া গ্রামের একদিকে মুসলমানের বাস। তাহারা বছর পঞ্চাশেক হইল এই গ্রামে আসিয়াছে। প্রথমে আসিয়াছিল চাঁদু মিঞা। তাহার পর চাঁদু মিঞার অনুগ্রহে দুইএকজন করিয়া আসিতে সুরু করে। ক্রমে ক্রমে তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। এখন দাঁড়াইয়াছে পঞ্চাশ ঘরে। ইন্দ্রাণী গ্রামের সকলেই বলে, মুসলমানেরা যে ভাবে বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা গ্রাম ছাপাইয়া তাদেরকে গ্রাস করিবে। অবশ্য ভাবিবার কথা নয়, কারণ ইন্দ্রাণী গ্রামের মুসলমান অধিবাসীরা হিন্দু পাড়ার দিকে না আগাইয়া ক্রমশঃ মাঠের দিকে ও নদীর ধারেই তাহারা আগাইয়া যাইতেছে। কথায় বলে, নদী গ্রাস করে একদিকে আর চড়া পরে অন্যদিকে ; কিন্তু ইহারা যেদিক গ্রাস করে সে দিকতো যায়ই, উপরন্তু চড়া পরে না অন্যদিকে।

ব্রাহ্মণ পাড়ার ননী ও কায়স্থ পাড়ার বিশ্বজিতের মধ্যে ভাব বেশী। এই লইয়া মাথা ব্যথা হয় ভবানী ঘটকের। সে শক্তি সামর্থ্যমান। সবল বাহুর জোরে সে একদল সঙ্গী জুটাইয়াছে। স্কুলে পড়িলেও সে নদীতে সাঁতার কাটে, নৌকায় চড়িয়া বাঁচ খেলে, গাছের ডালে ডালে বেড়ায়, তাহা ছাড়া সকলকে শাসন করিবার একটা ঝোঁক সব সময়েই তাহার মাথার ভিতর

খেলে। গ্রামের ছেলেরা তাহার শাসন মানিয়া চলিবে এই সে চায়। কিন্তু ননী ও বিশ্বজিত দুইজনেই দুর্ব্বল প্রকৃতির ছেলে। লেখাপড়ায় তাহারা ভাল। স্কুলে তাহাদের সুনাম আছে। কিন্তু হৈ চৈ, ছুটাছুটি এসব তাহারা ভালবাসে না, পারেও না। বিশ্বজিতের কবিতা লেখার ভয়ানক ঝোঁক। যাহা কিছু সে লেখে ননীকে না পড়াইলে তাহার চলে না। ননী সমঝদার ভাল। বিশ্বজিতকে কবিতা লেখার জন্য ক্রমাগত উৎসাহ দেয়। বিশ্বজিত তাহাতে খুবই খুসী হয়। কাজেই দুইজনে বেশ ভাব। তাহারা চুপচাপ বসিয়া পড়ার গল্প, খেলার গল্প আরও নানা রকমের গল্প লইয়া সময় কাটায়।

সকাল বেলায় বিশ্বজিত যায় ননীর বাড়ী পড়িতে। তাহার পাল্টায় ননী সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বজিতের কাছে পড়িতে আসে। একদিকে যেমন ননীর রাত্রে তেলের খরচ বাঁচে, অন্যদিকে বিশ্বজিতের অনুরোধও রাখে। বিশ্বজিতের ঠাকুরমা দেবদ্বিজে ভক্তিমতি। সন্ধ্যার পড়াশুনা শেষ হইলে ননীর মুখ হইতে কোনদিন রামায়ণ, কোনদিন মহাভারত আবার কোনদিন কোন পুরাণের কিছু অংশ শোনে। সারাদিন সাংসারিক খাটুনীর পর সন্ধ্যাবেলায় ভগবানের নাম করা বা শোনা কোন বৃদ্ধা না চায়? তাহাছাড়া নিজে শিক্ষিতা নয়, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা সাধ্যাতীত, কাজেই ব্রাহ্মণের মুখে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ রোজ শোনা তাহার পক্ষে ভাগ্যেরই কথা। তাই সে বিশ্বজিতকে দিয়া ননীকে ডাকইয়া পাঠায়। ননীর বাপের অবস্থা খুবই খারাপ। রাত্রে পরের বাড়ী গিয়া পড়াশুনা করিতে তিনি নিষেধ করেন না। এমনি ভাবে অনেকদিন চলে। ননী যখন ইচ্ছা তখনই বিশ্বজিতের বাড়ী যায়, আবার বিশ্বজিতেরও যখন ইচ্ছা হয় ননীর কাছে আসে।

জীবন-মৃত্যু

ননীর উপর বেশী অপ্রসন্ন হয় ভবানী ঘটক। পড়ায় না পারিয়া সে কেবল তাহারই দুর্ণাম করে বেশী। অনেকে বলে, ভবানী ননীর সঙ্গে পড়াশুনায় পারে না, তাই তাহার এই আক্রোশ। ভবানী বড় একরোখা ছেলে এবং ফক্কর। প্রমাণ করিতে চায়, ননী ব্রাহ্মণের ছেলে, হইয়া কায়স্থপাড়ায় পড়িয়া থাকে সাধে? বিশ্বজিতের বাড়ীতে যে মধু আছে। সে কি তাহা জানে না বা দেখে নাই। মাণিকমালার সঙ্গে তাহার অত ভাব কিসের? অত বড় সোমত্ত মেয়ে ননীকে দেখিলেই সে ছুটিতে ছুটিতে তাহার কাছে গিয়া হাজির হয়। হাসে, গল্প বলে আরও কত কি! এসব কি ভাল? ব্রাহ্মণের ছেলের এসব কি? বিশ্বজিতের বন্ধু বলিয়া তো আর সে হাতে মাথা কাটেনি? আরও কত কি বলে—পাড়ার লোকে প্রথমে ভবানীর উপর চটিত, তাহার পর তাহাদেরও সন্দেহ হইতে লাগিল। মাণিকমালার ব্যবহার তাহাদের কাছে ক্রমেই জানাজানি হইতে লাগিল।

একদিন মাণিকমালার কাণে তাহাদের কথা গেল। সে ঠিক করিল, ননীদা আসিলেই তাহাকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইবে, আপাততঃ কিছুদিন যেন সে তাহাদের বাড়ীতে না আসে। অমন সাধাসিধে, ভাল মানুষ ননীদার কোন দোষ সে কিছুতেই শুনিতে পারিবে না। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ননী আসিতেই মাণিকমালা তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া জানাইয়া দিল তাহাদের কলঙ্কের আভাষ।

ননী সে কথা মানিতে চায় না। বলে—"কলঙ্ক আবার কি? ভালবাসলে এমন কি পাপ হয়?"

—"তা হোক তুমি এ বাড়ী এসো না! তোমার কথা আর শুনতে পারি না!"

ননীর রাগ বাড়িয়া গেল। সে বলিতে লাগিল—"তোমার সঙ্গে হু'টো হেসে কথা কই, এই নিয়ে যদি পাড়ার পাঁচ জনে আমায় নিন্দে করে—করুকগে!"

—"না ননীদা, আমার দিব্বি, তুমি তোমার মান খুইয়ো না। তুমি বামুনের ছেলে আর কায়েতের মেয়ে আমি! এসব সত্যিই ভাল দেখায় না?"

—"তা না দেখাক্, আমি তোমায় না দেখে একদিনও থাকতে পারব না?"

—"তোমার পায়ে ধর্‌চি ননীদা! নিজের কলঙ্ক আর বাড়িও না?"

—"তা হোক্।"

—"এই তোমার পায়ে ধর্‌চি, তুমি আমার মাথা খাও, আর এসো না বলছি," বলিয়া ননীর পায়ে ধরিয়া মাণিকমালা কাঁদিতে লাগিল।

ভবানী ঘটক কয়দিন হইতে তাহার সাঙ্গ পাঙ্গ লইয়া বিশ্বজিতের বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিতেছিল। গলি দিয়া এধারে আসিতেই ননী ও মাণিক-মালার এই অবস্থা দেখিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল। তাহার সাঙ্গ পাঙ্গ সব ছুটিয়া আসিল। হৈ চৈ শব্দ করিতে লাগিল। ওদিকে মাণিকমালা ও ননী ইহাদের দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া একেবারে বিশ্বজিতের ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে। ভয়ে তাহারা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ভবানী ঘটক সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। এই সব দেখিয়া এই লইয়া তাহারা বিষ্ণুদের বাড়ী আসিয়া হাজির। চীৎকার করিয়া তাহারা সকলকে শাসাইতে লাগিল। বাড়ীতে মহা হুলু স্থুল পড়িয়া গেল। বাড়ীর লোকেরা তো অবাক্।

বিশ্বজিতের বাবা কি একটা কাজে বৈঠকখানা হইতে বাড়ীর ভিতরে আসিতেছিল, বাড়ীর ভিতরকার চীৎকার শুনিয়া সে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তারপর যখন ব্যাপারটা বুঝিল তখন রাগ গিয়া পড়িল ভবানীর উপর।—"কেন তাদের মত ষণ্ডা মার্কা ছেলেরা আমার বাড়ী এসে হল্লা করে? কি হয় না হয় সে বুঝবে।" বলিয়া ভবানীদের মারিতে যায়; গালাগালি দেয়।

ভবানী ঘটকের দল গতিক মন্দ দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। একা ভবানী কি করিবে? গজ্ গজ্ করিতে করিতে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল ননীকে শাসাইতে শাসাইতে।

ভবানী ঘটকের আস্ফালন নিষ্ফল গেল না। গ্রামশুদ্ধ সকলেই জানিয়া ফেলিল ননীর কীর্ত্তি। তবু সে বিশ্বজিতের বাড়ী যাইতে ছাড়িল না। তবে সংখ্যায় কম এবং যতদূর সম্ভব হইল গোপনে।

কিছুদিন এমনিভাবে চলিতে লাগিল। ননীর অনুরোধ ও প্রলোভন উপেক্ষা করা মাণিকমালার সাধ্যাতীত, তাই সে দিন দিন ননীর প্রেমজালে নিজেকে জড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকদিন কাটিয়া গেল। ননী ও মাণিকমালার ঘটনা ক্রমেই সকলে ভুলিয়া গেল। ননী ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বগুড়ায় চাকরী পায়! সেখানে সে থাকে, মধ্যে মধ্যে ছুটি পাইলে বাড়ী আসে।

একদিন ননীর বাপ ধরিয়া বসে—"ছেলেকে এবার বিয়ে করতে হবে; নইলে তাদের সংসার অচল।" মা অনুরোধ করে, অভিযোগ করিয়া কাঁদে কিন্তু ননী বোঝায়—"এই অল্প মাইনেয় বিয়ে ক'রে বৌকে

খেতে দেবে কি ?" মা বলে—"ওসব তোর বাজে কথা, আমরা যদি দুবেলা খেতে পাই, বৌমাও খেতে পাবে। ভগবান দেবেন।"

দুই তিন মাস পরে ননী বাড়ী আসে। বাড়ী আসিলেই বিশ্বজিতের বাড়ী যাওয়া চাই। সমস্তক্ষণ তাহাদের সঙ্গে গল্প না করিলে তাহার চলে না; বিশেষতঃ মাণিকমালার সঙ্গে।

লোকে ভাবে, ননী যখন বাহিরে চাকুরী করিয়া থাকে, তখন সে ভাল ছেলে। তাহার সঙ্গে যেকোন লোকের অবাধ মেলামেশা খারাপ নয়। বিশেষতঃ কয়দিনের জন্য তো!

বিশ্বজিত পাশ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছে। সে কয়েক জায়গায় চাকুরীর চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হয় নাই। কলিকাতা বার দুই ঘুরিয়া গিয়াছে, কোথাও কিছু সুবিধা করিতে পারে নাই। ওদের অবস্থা মোটামুটি ভালই, কাজেই পেটের দায়ে চাকুরী করিবার জন্য বিশ্বজিতকে দূরদেশে পাঠাইবার কাহারও ইচ্ছা নাই। বিশ্বজিত সেই অজুহাতে থাকে ভাল।

ননীর দৌলতে মাণিকমালা বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে।

ননী বিদেশে থাকিলেও বিশ্বজিতের সঙ্গে রীতিমত চিঠি দেওয়া নেওয়া করে। মাণিকমালাকেও সেই সঙ্গে তাহার কথা লিখিতে ভোলে না। বিশ্বজিতের সঙ্গে মাণিকমালাও রীতিমত উত্তর দেয়। কখন কখনও বিশ্বজিতকে উপলক্ষ্য করিয়া ননী ও মাণিকমালার মধ্যে চিঠির বিনিময় হয়। কিছুদিন পরে এই দুইজনের মধ্যে ঘন ঘন চিঠি আসিতে থাকে এবং নিছক্ প্রেমপত্রে সেগুলি পূর্ণ। এইভাবে সকলের অসাক্ষাতে এবং নিছক্ আধুনিক পর্য্যায়ে তাহারা ভালবাসা জানাইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতে লাগিল।

জীবন-মৃত্যু

ননী প্রায় চার মাস পরে বাড়ী আসিয়াছে। এবার তাহার বাপ মা আগে হইতে ঠিক্ ঠাক্ করিয়া রাখিয়াছে, ছেলে আসিলেই ভাবী বৈবাহিকদের সংবাদ দিয়া আনান এবং বিয়ের সম্বন্ধ একেবারে পাকা করা। ছেলের অমত উপেক্ষা করিয়া এবার তাহারা জোর করিয়াই তাহার বিবাহ দিবে। উপযুক্ত ছেলে হইয়াছে, চাকরী করে, বিবাহ করিবেই বা না কেন? এখনকার ছেলেদের ও একটা স্বভাব!

কিন্তু ননী আসিয়া যাহা বলিল তাহাতে তাহার বাপ মা একেবারে হতাশ হইয়া গেল। কোন কূল কিনারা না পাইয়া পাড়ার লোকেদের অনুরোধ করিতে লাগিল।

ছুটি ফুরাইয়া আসিলে ননী বাপ মাকে ও গুরুজনদের প্রণাম করিয়া কর্ম্মস্থলে রওনা হইল। বাপ কত কাঁদিল, মা কত কাঁদিল, তাহাকে শিগ্র বাড়ী আসিবার জন্য অনুরোধ করিল, গিয়াই যেন পৌছান সংবাদ দেয় সে কথাও বারবার তাহাকে মনে করাইয়া দিল।

পরদিন সংবাদ পাওয়া গেল মাণিকমালাকে তাহার বাপ মা'রা খুঁজিয়া পাইতেছে না। "ব্যাপার কি," বলিয়া গ্রামের লোকেরা ভাবিতে লাগিল।

ভবানী ঘটকের সন্দেহ, ঐ ননী। গ্রামের কেহ সে কথায় বিশ্বাস করে, কেহ করে না।

অবশেষে ভবানীর উৎসাহে জানা গেল এ কাণ্ড ননীরই বটে। সে কর্ম্মস্থলে যাইবার সময় মাণিকমালাকে লইয়া উধাও। সকলে তাদেরকে ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল।

মাস দুয়েক পরে ননীর বাপ যায় ছেলের মত ফিরাইতে। সঙ্গে তাহার

মাও যায়। কিন্তু বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিল। এত ভাল ছেলের যে পেটে পেটে এত শয়তানী বুদ্ধি আছে তাহা আর কে জানে ?

এমনি ভাবে দুইবছর কাটিল। ননীর বাপ দুঃখ করে, মা কাঁদে। কিন্তু মাসের পর মাস ননীর টাকা আসিতে থাকে। টাকা প্রাপ্তির সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু নিজেদের সংবাদ দেওয়া নেওয়া চলিতে লাগিল।

পর পর কয়েকখানা চিঠি ও বহু অনুরোধের পর ননী দিন কয়েকের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিল। সে এখন বহু টাকা রোজগার করে। গোপনে বহু প্রতিবেশী তাহার কাছে সাহায্য চান। কাজেই সকলে এই কারণে তাহাকে স্নেহের চক্ষেই দেখেন। ননীকে দেখিয়া সকলে খুসী হইলেন। তাঁহারা তাহাকে বাড়ী ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলে বলে—"ননী যদি মাণিককে ত্যাগ ক'রে এসে প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহলে আবার তাকে তারা সানন্দে সমাজে নেবে। —সোনা ধুলেই শুদ্ধ হয়।" কিন্তু মাণিকমালার কথা আর কেহ তোলে না। বিশ্বজিতের বাড়ীতেও এখন তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই ওঠে না।

লোকে বলে—"সোনা ভাঙ্গলে জোড়া দিয়ে গলায় পরা যায়। কিন্তু কাঁচ ভাঙ্গলে তাকে সকলে ফেলে দেয় এই সংসারের নিয়ম !"

বিশ্বজিত বরাবরই বোনের খবর লইত। সে পূর্ব্বের মতই ননীর সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতে লাগিল। দুইজনের মধ্যে কোন গোলমাল বা লজ্জা-সঙ্কোচ নাই। বিশ্বজিত ননীর এ বিষয়ে কোনদিন

দুঃখ প্রকাশ করে নাই। সে মধ্যে মধ্যে গোপনে গিয়া ভগ্নি ও ভগ্নিপতির সহিত দেখা শুনা করিয়া আসিত। কিছুদিন পরে যখন সংবাদ পাইল মাণিকমালা সন্তান-সম্ভবা, সে তৎক্ষণাৎ নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য লইয়া দেখা করিতে গেল। তাহার পর সন্তান হইলে যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া আদর আপ্যায়নের ক্রটী করিল না। সামাজিক বিধানকে সে স্পষ্টই এড়াইয়া চলিল। মাণিকমালা ও ননীর দাম্পত্য-জীবন আনন্দের হইয়াছে জানিয়া বিশ্বজিত মনে মনে খুসী হইত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভবানী ঘটক এখন বালিগঞ্জের অবিনাশের বাড়ীতে থাকে। সম্প্রতি সে গ্রামের স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আসিয়া ভবানীপুর আশুতোষ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। গ্রামে থাকিয়া এ পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়া গিয়াছিল। কেবল পরীক্ষা দিবার সময় সে একবার মাত্র বর্দ্ধমান সহরে আসিয়াছে। সেই অবসরে বর্দ্ধমান সহরের সব কিছু এক রকম দেখিয়া লইয়াছে এবং ইহা লইয়া সে যে ভাবে গল্প করিতে থাকে হঠাৎ কেহ তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই মনে করিবে, হয় সে বর্দ্ধমান সহরেই থাকে নয় সেখানে অনেকদিন ধরিয়া কাটাইয়াছে। কথা বলিবার ভঙ্গী তাহার অদ্ভুত। একটী কথাকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া একশোখানায় সে দাঁড় করায়। গম্ভীর হইয়া এমনভাবে কথাগুলিকে সাজাইয়া সাজাইয়া বলে যে, অতি বড় বৃদ্ধকেও তাহার কাছে হার মানিতে হয়। তবে যাহারা তাহাকে চেনে তাহারা বয়াটে, ফক্কর ও ডেঁপো ইত্যাদি নানাপ্রকার বলিয়া উপহাস করিয়া যায়। এই প্রকার ছেলে ভবানী ঘটক কলিকাতায় আসিয়া পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে যে সবজান্তা ওস্তাদ হইয়া পড়িবে তাহার আর বিচিত্র কি?

দেশে তাহার বাপ, মা, ভাই, বোন ইত্যাদি সকলেই আছে। সে বাড়ীর বড় ছেলে, তাহার উপর সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে; কাজেই তাহার পিতা অবিনাশকে অনুরোধ করায় সে তাহার বাড়ীতে

ভবানীকে রাখিয়া কলেজে পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়াছে। ভবানী দুইবেলা কাকার কাছে খায় ও থাকে। কাকাও সেই সুযোগে ভবানীকে দিয়া তাহার ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। অবিনাশ এখন মোটা মাহিনার চাকুরী করে। ভবানী যখন নিতান্ত শিশু তখন হইতেই তাহার বাপ মা পুত্রকে তাহার কলিকাতার বাসায় রাখিয়া পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছে। ভাইপো পাশ করিলেই তাহার আশ্রয়ে রাখিয়া কলিকাতার কোন কলেজে পড়াইবে এ কথায় তাহার সম্মতি ছিল। কাজেই ম্যাট্রিক পাশ করিবামাত্র ভবানীর কলিকাতায় আশ্রয় জুটিল। ঠিক কলিকাতায় নয়, বালিগঞ্জে।

কলেজে পড়িলে বন্ধুর অভাব হয় না। তাহার উপর ভবানী মিশুকে ছেলে। কয়েক মাসের মধ্যেই সে অনেকগুলি বন্ধু লাভ করিয়াছে। তবে অমর, প্রমথ, যোগেন ও কমলের সঙ্গেই তাহার ভাব বেশী। কমল অবিনাশের বড় ছেলে। সেও এবার আশুতোষে ভর্ত্তি হইয়াছে। সকলেই সম-বয়সী। বিকালের দিকে তাহারা কোন দিন গড়ের মাঠে, কোন দিন এখানে সেখানে বেড়াইয়া সময় কাটাইত। ভবানী যেরূপ আস্ফালন করে তাহাতে সকলেরই একরূপ ধারণা যে, সে ইহার মধ্যে গোপনে একটা কিছু করিয়াছে। এক এক দিন সে স্পষ্টই জানাইয়া দেয় যে, তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সে যাহা পাইয়াছে তাহা ভাগ্যবানেরই প্রাপ্য। বড়-লোকের কন্যা, একমাত্র ও অপরূপ সুন্দরী। বন্ধুরা ঘিরিয়া বসে। বলে—"তারপর কি?"

—"তারপর—"

ভবানী ঘাড় বাঁকাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিয়া যায়—"আরো কত!"

আর হাসে। ইহাতে বন্ধুদের আগ্রহ আরও বেশী বাড়ে। তাহারাও হাসিতে হাসিতে বলে—"বেশ, বেশ, তারপর কি হলো। কইতো কোন চিঠি দেখালি না? শ্রীহস্তের লেখা না দেখালে আর আমরা মোটেই বিশ্বাস করবো না। ও সব চালাকী আর চলবে না। মেয়েরও কাজ নাই, এতো থাকতে তোর সঙ্গে পীরিত জমাবে।"

ভবানী হাসিতে হাসিতে বলে—"আচ্ছা, কত দেখবি তার চিঠি? তাড়া তাড়া আমার কাছে আছে। তবে সব দেখাবো না তোদের। মাত্র দু'একখানা দেখালেই তো বিশ্বাস করবি? আচ্ছা তা দেখাবো!"

এমনি করিয়া প্রত্যহ নানা কথার মধ্যে একবার করিয়া ভবানীর নূতন প্রেমের বার্ত্তা ওঠে।

সত্যইতো একখানা চিঠি। রুলটানা কাগজের উপর কাঁচা হাতের লেখা; অনেক কথাই ইহার মধ্যে আছে। লেখাটা মেয়েলী ধাঁচের বলিয়াই মনে হয়। চিঠিখানা হাতে পাইয়া বন্ধুরা কতকটা আশ্বস্ত হয়।

লীলা লিখিয়াছে—"তোমার সঙ্গে সেদিন যে দেখা হয়েছিল তারপর আজ পর্য্যন্ত আর দেখা নাই। ব্যাপারখানা কি? তুমি কি আমায় ভুলে গ্যাছ? কিন্তু আমার মনে তুমি যে ছাপ এঁকে রেখেছ তা ভুলবার নয়। সর্ব্বদা তোমার স্মৃতি নিয়েই আমায় দিন কাটাতে হচ্ছে। তোমার ক্ষণেকের দেখা পাবার আশায় আমি উৎকণ্ঠায় আছি। যত শীঘ্র পার আমায় দেখা দিয়ে এ প্রাণ শীতল কর।"

আরও অনেক কথাই সে লিখিয়াছে এবং প্রায়ই লেখে বলিয়া ভবানী ঘটক হাসিতে থাকে আর সেই সঙ্গে তাহার বন্ধুদের জানিবার আগ্রহ বাড়িয়া উঠে বেশী।

ভবানী মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়। আবার সময় সময় এমন ভাব দেখায়, দেখিলে যেন মনে হয় সে দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছে। গম্ভীর হইয়া কেবলই মাথা দোলাইতে থাকে আর হাসে।

চিঠি পড়িয়া বন্ধুর দল অবাক হইয়া ভবানীর মুখের পানে তাকায়। ভাবে, ভবানী বাহাদুর ছেলে! এই জনারণ্যে একটা আশ্রয় সে পাইয়াছে। এ আশ্রয় সুখের হইবে নিশ্চিত। ইহাতে তাহারা আনন্দ উপভোগ করে; আবার সময় সময় তাহাদের মনে হিংসাও জাগে।

এমনিভাবে দিনের পর দিন চলে। চিঠির পর চিঠি দেখায়। একই হাতের লেখা—অসরল, উচ্ছ্বাসময়, প্রেমপূর্ণ, বর্ণাশুদ্ধিবহুল ও সেণ্ট মাখান। বন্ধুরা সাগ্রহে ভবানীর প্রেমিকার প্রেম ভিক্ষা পড়ে আর মাঝে মাঝে পত্রের ঘ্রাণ লয়।

তারপর একদিন একখানা ফুলতোলা নামলেখা, গন্ধযুক্ত রুমাল বন্ধুদের দেখায়, আর বলে—"আরও এমনি অনেক আছে।"

একে একে যতগুলি পারে প্রেমিকের দান দেখায়। কোন কোনটী বা বন্ধুদের বিতরণ করে। এমনি করিয়াই ভবানী আনন্দ পায় ও বন্ধুদের আনন্দ ও কৌতূহল জাগাইয়া তোলে।

একদিন বন্ধুরা ধরিয়া বসিল, তাহাকে এই প্রেম কাহিনীর ইতিহাস বলিতেই হইবে।

ভবানী মুখ টিপিয়া হাসে, এদিক ওদিক চায়, বলিবার আগ্রহ দেখায়, কিন্তু বলে না।

জীবন-মৃত্যু

সকলের মধ্যে কমলের আগ্রহ বেশী। সে সময় সময় অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে ভবানীকে ধাক্কা দিয়া বলে—"আর ফাজলামি করতে হবে না। ওসব পাকামী ভাল লাগে না। ইচ্ছে হয়তো বল আর না হয়তো আমাদের কাছ থেকে দূর হ। প্রেম করেছ, যেন বড় ভাল করেছ? ওসব কুকর্ম্ম ক'রে হাসতে ভাল লাগে তোর? দাঁড়া আমি তোর সব কথা মাকে আজ বলে দিচ্ছি।"

অমরও সেই সঙ্গে বলিয়া বসে—"ঠিকইতো, ভবানী ভালো চাসতো বল, আর তা' না হ'লে তোর ঐ সব কীর্ত্তি তোর কাকাকে বলে দেবো। তখন মজা দেখবি!"

—"আচ্ছা, তবে শোন," বলিয়া ভবানী হাসিতে থাকে, নানারূপ ভঙ্গী দেখায়।

এবার সকলেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। ভালো করিয়া বসিয়া লইয়া বলে,—বল্‌রে বল, তোর কীর্ত্তি।"

ভবানী এবার আরম্ভ করিল তাহার প্রেমের ইতিহাস:

"আজকে আসছিলাম ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে; রাস্তার ওপরেই তাদের বাড়ী। দেখলাম একখানা নীল শাড়ী আর রঙীন ব্লাউজ গায়ে দিয়ে সে ছাদে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। আমাকে দেখেই ইসারায় ও দাঁড়াতে বললে। কার্নিসের ধারে এগিয়ে এসে কত কথা যে বললে তার ঠিক নাই। আমিও তার সঙ্গে অনেক কথাই বললাম। তার ইচ্ছা হলো যেন আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসে। আমিও রাজি হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে রাস্তা পার হ'য়ে ও আমার কাছে এলো। বললে, ঐ পার্কে চলো। তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে পার্কটার

একটা বেঞ্চে বসে অনেক গল্প গুজোব করলাম। তারপর, ও বাড়ী চলে গেল। আমিও চলে এলাম।"

—"এই কি তোর প্রেমের ইতিহাস! গোড়া থেকে কি হোল তাই বল।" বলিয়া কমল তাহার পিঠে এক চাপড় দিল।

ভবানীকে অগত্যা গোড়া হইতেই তাহার কাহিনী বলিতে হইল। তবে যাহা বলিল তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই :—

তাহার নাম লীলা। অযোধ্যা মামার বাসার কাছেই তাহাদের বাড়ী। স্বজাতি এবং নিকট আত্মীয়া বলিয়া তাহার মামীমারা লীলাদের বাড়ী প্রায়ই যাওয়া আসা করে। লীলাও এই সূত্রে মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ী আসিত। কখন কখন ভবানীকেও লীলাদের বাড়ী যাইতে হইত। একদিন কোন কারণে লীলাকে তাহার বাড়ীতে পৌছিয়া দিতে হইল। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা হয়। তাহার পর দুইজনের মধ্যে বেশ ভাব হয়। মাঝে মাঝে দুইজনের মধ্যে গোপনে কথাবার্ত্তা, পত্রাপত্রি আদান প্রদান চলিতে থাকে। অবশেষে অপরিণত বয়স্ক যুবক যুবতীর পক্ষে যাহা হওয়া অস্বাভাবিক নহে তাহাই হইল।

নিজের কাহিনী শেষ করিয়া ভবানী রুমাল দিয়া মুখ মুছিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"শুনলি তোরা, এইতো ব্যাপার!"

আত্মকাহিনী বলিবার পর হইতে ভবানীর সাহস যেন বাড়িয়া গিয়াছে। আগেকার মত আর লজ্জা করে না। বন্ধুদের প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া ঐ বিষয় লইয়া নানা কথা বলিতে থাকে। ক্রমে তাহার মাত্রা এত বেশী বাড়িতে লাগিল যে, তাহার কথায় আর কেহ রস বোধ করে না, আগ্রহ

দেখায় না। ভবানী এখন যাচিয়া কথা পাড়ে, একই কথার পুনরাবৃত্তি করে, অনর্গল বকিয়া চলে। ফলে বন্ধুদের মনে বিরক্তি জাগে।

একদিন সকলে মিলিয়া ধরিয়া বসিল, তাহার লীলাকে দেখাইতেই হইবে। ভবানী এবার মহা বিপদে পড়িল। তাহার মনের কথা সত্যই যদি কেহ জানিত, তাহা হইলে এ প্রশ্ন তুলিয়া তাহাকে এরূপভাবে অপদস্থ করিতে কাহারও মনে ইচ্ছা জাগিত না।

এমনভাবে তাহাকে ধরিয়া বসিয়াছিল যে অগত্যা তাহার লীলাকে বন্ধুদের না দেখান ছাড়া উপায় নাই।

একদিন বিকালের দিকে বন্ধুদের সঙ্গে করিয়া ভবানী ল্যান্সডাউন রোডের দিকে যায়। বিকালের দিকে মেয়েদের পার্ক হয় সাধারণতঃ বাড়ীর ছাদে। ছাদে বসিয়া মেয়েরা মিলিয়া জটলা করে। প্রায় সমস্ত ছাদেই এই রকম হয়। বিকালে বেড়াইতে বাহির হইলে সাধারণতঃ ইহাই চোখে পড়ে।

ভবানী সপারিষদ এদিক ওদিক তাকাইতে থাকে কিন্তু আসল লক্ষ্য থাকে ছাদের দিকে। সে তাহার গন্তব্য স্থান জানে, কিন্তু বন্ধুরা জানে না বলিয়া আগ্রহের সঙ্গে কেবল ছাদ লক্ষ্য করিয়া চলে আর ভাবে ইহাই নাকি?

ভবানীর চোখে পড়িল সেই বাড়ী, সেই ছাদ। কিন্তু কেহই নাই। বাড়ীর সামনে ছোট ছোট গুটিকয়েক ছেলে মেয়ে চাকরের সঙ্গে খেলা করিতেছে। স্তব্ধ হইয়া সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছেলেমেয়েদের পানে তাকাইল। তারপর একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তাহ'লে আজ আর হ'লো না। তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নাতো। অন্যদিন আসিস দেখাবো।

হতাশ হইয়া বন্ধুরা ফেরে। সকলেই একবার স্মরণ করিয়া লয় ভবানীর সমস্ত কাহিনী। কল্পনা করে একটী মেয়েকে—সুন্দরী, তরুণী। তারপর তাহারা একে একে নিজেদের বাড়ী ফিরিয়া যায়।

দুই চারিদিন পরে আবার বন্ধুদের অনুরোধে ভবানীকে সেই পথ দিয়া যাইতে হয়। এবার ভবানীর চোখে পড়িল একটী মেয়ে। সেই বটে! বন্ধুদের দেখায়। তারপর তাহার সম্বন্ধে নানা কথা লইয়া পার্কে বসিয়া জটলা করে।

বন্ধুরা এখন হইতে যখন ও রাস্তা দিয়া যায়, প্রায়ই একবার করিয়া সেই বাড়ীটির দিকে নজর ফিরায়। কখনও দেখে এক বৃদ্ধ বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছে, কখনও বাড়ীর দুই চারিটি ছেলেমেয়ে বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া খেলা করিতেছে। কখনও বা সেই সুন্দরী তরুণীকে তাহাদের চোখে পড়ে, আর কল্পনায় তাহার কথা ভাবিয়া লয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পার্কে বসিয়া বন্ধুরা জটলা করে। সে দিন কি কারণে ভবানী আসিয়া জুটিতে পারে নাই। নানা কথার পর প্রমথ ভবানীর কথা পাড়িয়া সকলকে শোনায় যে, সে একটা নূতন সংবাদ পাইয়াছে এবং ইহা লইয়া ভবানীকে একহাত দেখাইবে। ভবানী যে এতদিন তাহাদিগকে বাজে ধাপ্পা দিয়া ভুলাইয়া আসিতেছে, মস্ত চাল চালিয়া নিজের কৃতিত্ব দেখাইয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এবার তাহার উপযুক্ত ফল না দিয়া সে ছাড়িবে না।

সকলে ভাবে, তাইতো, সব মিথ্যা, বাজে। নাঃ একটা শাস্তি তাহাকে দিতেই হইবে। তারপর ভাবিতে বসিল কি করিয়া তাহাকে জব্দ করা যাইবে।

ইত্যবসরে ভবানী দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাদের কাছে দেখা দিল। ভবানীকে হাসিতে দেখিয়া অমিয় তাহাকে কাছে ডাকিল। ইসারায় তাহাকে দূরে লইয়া গিয়া জানাইল যে, সে সংবাদ পাইয়াছে লীলারা কালকে চিত্রায় ছবি দেখিতে যাইবে। আমাদের ইচ্ছা ঐ শোতে টিকিট কাটা, তাহা হইলে তাহার দেখা ভাল করিয়াই পাইতে পারে।

ভবানী রাজী। বন্ধুরাও রাজী। স্থির করিল সকলেই ঐ দিন বিকালের শোতে চিত্রায় যাইবে। তবে একটা কথা, দল বাঁধিয়া না গিয়া পৃথক পৃথকভাবে যাওয়া মন্দ কি! নিজের নিজের বাড়ী হইতে

বরাবর সকলে এসপ্লানেডের মোড়ে আসিয়া জমিবে, তারপর না হয় এক সঙ্গে যাওয়া হইবে।

পূর্ব্ব যুক্তিমত বন্ধুদের সিনেমা যাওয়া হইল না। তাহারা পার্কে বসিয়া জটলা করিতে লাগিল। এদিকে ভবানী লীলার মোহে পড়িয়া চিত্রায় হাজির। থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটিয়া ভিতরে গিয়া তাহার কেবল লীলার কথাই মনে পড়িতেছিল। কেবল তাহাকে খুঁজিতেই সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। শো আরম্ভ হইলে ঘর অন্ধকার হইবে, কাজেই সে তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। কিন্তু কাহারও দেখা পাইল না। না বন্ধুদের, না লীলাদের। ভাবিল তাহারা হয়তো ঠিক সময়ে আসিতে পারে নাই বলিয়া দেখা হইল না। অগত্যা সে চুপ করিয়া ছবিই দেখিতে লাগিল। তারপর ইণ্টারভ্যাল। ঘর আলো হইয়া উঠিল। ভবানী এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করিয়া যখন কাহারও দেখা পাইল না তখন হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।

পরদিন যথারীতি পার্কে আসিয়া ভবানী জুটিল। বন্ধুদের দেখা পাইল না বলিয়া সে অত্যন্ত দুঃখিত। তবে লীলার সহিত যে তাহার ভাল করিয়াই আলাপ হইল ইহা অবশ্যই আনন্দের কথা।

বন্ধুরা ধরিয়া বসে—"সিনেমায় কি হল ? কেমন প্লে ? লীলারা কে কে এসেছিল ? সে কি বললে ? কেমন আলাপ হল.?" ইত্যাদি।

ভবানী হাসিতে থাকে আর বলে—"খুব ভালই হ'ল। সবই ভাল। লীলার বাবা, মা, তার এক দিদি, আর গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে এসেছিল। আমাদের আগে থেকেই কথা ছিল। লীলারা যে সেদিন চিত্রায় যাবে তা আগে থেকেই সে আমায় জানিয়েছে।"

বন্ধুরা হাসে, ভবানীও হাসিতে থাকে।

ভবানীর সাহস এখন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বন্ধুদের মধ্যে সে লীলার সম্বন্ধে এত কথা বলিয়া বসে যাহা শুনিয়া বন্ধুদেরও লজ্জা হয়। ভবানী এখন আর বন্ধুদের সঙ্গে বিকালের দিকে সব দিন মিশিতে সুযোগ পায় না। কারণ অনেক। সে স্পষ্ট জানাইয়া দেয় লীলাদের বাড়ী তাহাকে প্রায়ই যাইতে হয়। বাড়ীর সকলেই তাহাকে খুব স্নেহ করেন। লীলা সত্যই তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। প্রায়ই দুইজনের লেকে ইডেন গার্ডেনে না হয় সিনেমায় দেখা হয়। তবে খুব গোপনে। তাহার বাপ মা নাকি এবিষয়ে বড় গোঁড়া। ছেলেমেয়েদের অবাধ গতিবিধি তাঁহারা পছন্দ করেন না। কিন্তু হইলে কি হয়, গাই বাছুরে ভাব থাকিলে বনে গিয়া দুধ দেয়। লীলা এ বিষয়ে খুব সতর্ক। একদিন তাহার দেখা না পাইলে সে চঞ্চলা হইয়া উঠে। পরদিন নানা কথা শুনাইয়া দেয়।

অমিয় বলে—"সত্যি কথা ভাই, সেদিনই দেখলাম লীলাই বটে, কার সঙ্গে যেন ইডেন গার্ডেনে বেড়াচ্ছিল।"

—"পরশুদিন তো, ঠিক কথাই! আমার সঙ্গে সেদিন তার অনেক কথা হ'ল। অনেক গল্প গুজব ক'রে তবে বাড়ী ফিরি।"

—"লেকেও একদিন তাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে" বলিয়া প্রমথ হাসে।

—"একদিন মানে, মাঝে মাঝেইতো সে আর আমি যাই। এর আর কথা কি? সত্যি ভাই, লীলা যেন আমার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। এমন মেয়ে আর দেখিনি। মন তার খুব ভাল।" বলিয়া ভবানীর মুখে হাসি আর ধরে না।

এমনি করিয়া লীলা-ভবানীর প্রেম কাহিনী চলিতে থাকে।

ভবানীর সঙ্গে দিন কয়েক দেখা হয় নাই বলিয়া অমিয় একদিন তাহার কাছে গেল। কেন সে তাহাদের সঙ্গে মেশে না বলিয়া অমিয় তাহাকে অনেক কথাই শুনাইয়া দিল। এ কথাও স্মরণ করাইয়া দিল যে, লীলার জন্য কি তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করা তাহার উচিত?

ভবানী লীলার নাম শুনিয়া এমন ভাব দেখাইল যেন ইহার মধ্যে তাহার সঙ্গে একটা বিচ্ছেদভাব হইয়াছে। কোনো কারণে তাহার সঙ্গে যেন একটু মনোমালিন্যও দেখা দিয়াছে।

ভবানীর কথা শুনিয়া অমিয় হাসিয়া উঠিল। বলিল—"হাজার হোক সেতো মেয়ে মানুষ, সে আর কতদিন থাকতে পারবে, অগত্যা তাকে সাধতেই হবে।" তারপর হাসিতে হাসিতে বলিল—"একটা সুখবর আছে, আমাকে যদি খাওয়াতে পারিস তাহলে দেবো নইলে চল্লাম।"

ভবানীর আগ্রহ বাড়ে। সে বিমূঢ়ের মত তাহার পানে চাহিয়া থাকে। দেখিলে মনে হয় রাধার বিরহে কৃষ্ণ যেমন ভাবে রাধার সখীর কাছে তাহার প্রেম নিবেদন জানায়, সেইভাবে।

ভবানীর মুখের পানে তাকাইয়া অমিয়র দুঃখও আসে হাসিও পায়। সে কিছু না বলিয়া পকেট হইতে একখানা চিঠি দেখায়।

চিঠি দেখিয়া ভবানী অবাক হইয়া যায়। ভাবে এ লেখা সে কোথা হইতে পাইল? লীলার সঙ্গে কি তাহার পরিচয় পূর্ব্ব হইতে ছিল? না লীলা কাহারও হাত দিয়া এ চিঠি আমাকে দেয়, কোন কারণে হয়তো অমিয়র হাতে তাহা আসে। যাই হোক, ভবানী চিঠিখানা ভাল করিয়া পড়ে; একবার, দুইবার, তিনবার পড়িয়া লক্ষ্য করে লেখাটা কার।

জীবন-মৃত্যু

চিঠিখানা বিরহপূর্ণ। মিলনের জন্য সে আগ্রহ দেখায়। সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ীর পাশের পার্কে ভবানীর সাক্ষাৎ কামনা করে।

ভবানী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। অমিয়কে সন্দেশ খাওয়াইবার প্রতিশ্রুতিও দেয়। মনে মনে ভাবে কি ব্যাপার!

সোমবার বৈকাল হইতে ভবানী পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পার্কে গিয়া এধার ওধার করিতেছে, আর ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকায়—প্রিয়ায় খোঁজে। ক্রমে বৈকাল চলিয়া যায়, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, তখনও লীলার দেখা নাই। মস্ত বড় পার্ক। একধার হইতে অন্যধার দেখা যায় না। তাই সে ভাবে হয়তো আমারই খোঁজে লীলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে নাকো!

ভবানী ঘন ঘন পায়চারি করে। আর অসীম আগ্রহে চারিদিক তাকায়, কি যেন খোঁজে। অবশেষে হতাশ হইয়া একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়ে। ভবানী তাকাইয়া দেখিল, পাশের ভদ্রলোকটি যেন তাহার পানে বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিয়াছে। কি যেন বলিতে চায় সে, এমন ভাব দেখায়। ভবানী তাহার কাছে সরিয়া বসে। তাহার কাছ হইতে কি যেন জানিবার ভাব দেখায়। হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল বেঞ্চের পাশেই একখানা কাগজের টুকরা। সে আগ্রহে তুলিয়া ধরে, দেখে তাহারই চিঠি। সেই হাতের লেখা, অতি প্রিয় সম্বোধনে তাহার কাছে নিবেদন জানায়। দুঃখ করিয়া লেখে এত করিয়াও তাহার দেখা পাইল না বলিয়া। ভবানীর মাথা ঘুরিতে থাকে। চোখে সরিষার ফুল দেখে। যাহার জন্য বৈকাল হইতে সে ঘুরিয়া মরিতেছে, অথচ ইহারই মধ্যে সে কোন সময়ে আসিয়াছে, কিন্তু দেখা পায় নাই। সন্ধ্যায় সে আসিয়াছে আমারই অভিসারে, অথচ আমি তাহার দেখা পাইলাম না। ইহা কি বৃথাই গেল। ভাবিয়া

ভবানী হতাশ হইয়া বেঞ্চে হেলান দিয়া অনিমেষ নেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে।

পাশের ভদ্রলোকটীর সন্দেহ জাগে। ভবানী কি খুঁজিতে খুঁজিতে পাশে আসিয়া বসিল, এক টুকরা কাগজ সে যেন কুড়াইয়া লইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা পড়িল। তারপর অবসন্ন হইয়া পড়িল কেন? ইহাতে সাধারণের বিস্ময় জাগিবার হেতু না হইয়া কি হইতে পারে!

ভদ্রলোকটী ভবানীর গায়ে হাত দেয়। বলে—"মশাই ভাবছেন কি? কি হলো?"

ভবানী মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকায়। কোন কথা বলে না। হাতের চিঠি কোন সময়ে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, বিরহী ভবানী তাহার খেয়াল রাখে নাই।

ভদ্রলোকটি চিঠিখানা পড়িয়া ভবানীকে ধাক্কা দিয়া বলেন—"ও মশাই শুনুন, আপনি বরং এই দিকে যান! একটি মেয়ে কিছুক্ষণ হলো এই দিক দিয়ে ঘোরাফেরা কচ্ছিল। এটা তারই লেখা বলে মনে হয়। সে ছাড়া কে আর এ কাজ কর্ব্বে। সত্যি, তার মুখ চোখের অবস্থা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। সে যেন কার ও কি খোঁজে সন্দিগ্ধভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল আর ঘুরছিল। আপনি আর দেরী করবেন না। আমার মনে হয় মেয়েটি এখনও বেশী দূর যেতে পারেনি, দূরে যেন অস্পষ্ট তাকেই দেখা যায় না কি? দেখুনতো ঐ কি না?"

ভবানী উঠিয়া দাঁড়াইল। চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া অভিসারিণী লীলার উদ্দেশ্যে দুই এক পা করিয়া আগাইয়া গেল। দূরের দিকে একবার

চাহিল। পাশে লাইট পোষ্টের আলোয় আবার একবার চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিল।...

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে সে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিতেছে একটী নারী মূর্ত্তি! তাহারই প্রেমিকা লীলা! অভিসারিণী লীলা! সুন্দরী তরুণী লীলা!

একদল ছোকরা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। একজন তাহার চিঠিখানা হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। আর একজন তাহার কাণ ধরিয়া টানিতে লাগিল। বাকী সকলে হো হো করিয়া হাসিতে থাকে।

ভবানীর সম্বিত ফিরিয়া আসে। অবাক বিস্ময়ে, মুগ্ধনেত্রে তাহাদের পানে সে তাকাইয়া থাকে। কোন কথা আর বলিতে পারে না।

প্রমথ তাহার মুখে একটী চুমু দিয়া বলিল—"ভাই বিরহ ছাড়ো! অভিসারিণী লীলা এতক্ষণ বাড়ী পৌছে গেছে, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? পাড়াগাঁয়ের ছেলে ছ'মাসের মধ্যে এখানে এসে যে প্রেমে পড়বে তা আমরা আগে থেকেই জানতাম। তবে তোমার দৌড় কতদুর তাই দেখবার জন্তেই এতদিন আমরা চুপ করে ছিলাম। তোমার প্রেমিকার নাম ক'রে যে সব চিঠি দেখিয়েছ, সে লেখা যে কার তাও আমাদের জানতে বাকী নাই। বন্ধু, আমাদের ক্ষমা করো।

ভবানী তেমনি ভাবেই মুগ্ধনেত্রে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। লজ্জায় তাহার মাথা আপনা হইতেই নীচু হইয়া আসিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ভবানী পরপর আই-এ ও বি-এ পাশ করিল। অবিনাশের চেষ্টায় একটা চাকুরী তাহার ভাগ্যে জুটিল। এখন আর সে তাহার কাকার বাসায় থাকে না। কলিকাতার এক মেসে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

চাকুরী পাওয়ার পর তাহার বাপ মা ভবানীর বিবাহ দিয়াছে। এখন ছুটি পাইলেই ভবানী দেশে যায়। ইন্দ্রাণী গ্রামের অনেকেই এখন কলিকাতায় চাকুরী করে। কয়েকজন সময় সময় ডেলি প্যাসেঞ্জারিও করে। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রাণী গ্রামের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। ননী বগুড়ায় চাকুরী করে। তাহার তিন চারিটী ছেলেমেয়ে হইয়াছে। সে ক্বচিৎ কখন গ্রামে আসিয়া বাপ মাকে দেখা দিয়া যায়। বিশ্বজিত পাশ করিয়া বসিয়া আছে। সম্প্রতি কবি হওয়ার ঝোঁক তাহার চাপিয়াছে বেশী। বন্ধুদের মধ্যে অনেকে পাশ করিয়া বা স্কুল ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চাকুরী করিতেছে। তাহারাও মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসে। অবিনাশের বড় ছেলে কমলের ইন্দ্রাণী গ্রামের উপর ভীষণ টান। সেও ছুটি পাইলে দেশে যাইত।

দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রাণী গ্রাম, দামোদর নদী, গিরিরাণী আশ্রম পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

এমনি করিয়া মাসের পর মাস চলিতে লাগিল।

এক শনিবারের লোকালে উইক-এণ্ড টিকিট কাটিয়া ভবানী একদিন বাড়ী রওনা হইল। গাড়ীতে উঠিয়া হাতের বোচ্‌কা দুইটা এক পাশে

রাখিয়া দরজায় ঠেস দিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল আর রুমাল দিয়া মুখের ও ঘাড়ের ঘাম মুছিতে লাগিল। ইতিমধ্যে গাড়ীর ভিতরে তখন কে একজন ঢুকিয়াছে। সে ভাঙ্গা গলায় আরম্ভ করিয়াছে—'শঙ্কর কেমিকেলের গণ্ডার মার্কা আশ্চর্য্য মলম। এই মাজন ব্যবহারে আপনারা' ...বলিতে হইল না, পাশের একটি লোক ভীড়ের জন্য পিছন হইতে তাহাকে এমন ভাবে ধাক্কা মারিল যে ক্যানভাসারটি পাশের একটি স্ত্রীলোকের উপর গিয়া পড়ে আর কি! খুব সামলাইয়া লইয়া সে আবার চিৎকার করিয়া আরম্ভ করিল—'গণ্ডার মার্কা আশ্চর্য্য মলম ব্যবহারে আপনি সদ্য ফল পাবেন। এখন একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন। পয়সা লাগ্‌বেনা। বিনামূল্যে! একেবারে বিনামূল্যে!' বলিয়া কৌটা হইতে খানিকটা মলম বাহির করিয়া যাহাকে যাহাকে পারিল কামরার সব-যায়গা ঘুরিয়া নমুনা দেখাইয়া আসিল।

একজন বৃদ্ধার সখ হইয়াছিল বিনামূল্যের মলমের একটু সদ্ব্যবহার করিতে, কিন্তু অত লোকের সামনে মেয়ে মানুষ হইয়া কি করিয়া সে চাহিবে! তাহার উপর পাড়াগাঁ হইতে সে আসিয়াছে! কাজেই কিছু বলিতে না পারিয়া কেবল একদৃষ্টে ঐ ক্যানভ্যাসারটির দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্যানভ্যাসারটি আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিল। এবার আশ্চর্য্য মলম নয়—দাঁতের মাজন। তাহার মাজন যে চিরপ্রসিদ্ধ ইহা সকলেই জানেন এই ভাব লইয়া প্রথম আরম্ভ। সে যে অনেকের পরিচিত এবং অনেকেই ইহার সুফল পাইয়া আবার ইহা লইয়াছেন একথাও বারবার সকলের সামনে জানাইতে লাগিল।

জীবন-মৃত্যু

লিলুয়ায় আসিয়া ট্রেন থামিল। ক্যানভাসারটী একবার সকলের কাছে ঘুরিয়া নিরাশ হইয়া কামরা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার এক পয়সাও বিক্রয় হয় নাই। তবু সে হাসিতে হাসিতে অন্য কামরায় গেল।

লিলুয়া ছাড়িল। ইহার মধ্যে যাত্রীরা একটু হাঁপ ছাড়িয়া লইল। নিজের নিজের যায়গা ঠিক করিয়া লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাল করিয়া বসিয়া নিজেদের মধ্যে গল্প করিবার সুযোগ পাইল।

কামরাটি বেশ বড়। লেখা আছে বত্রিশ জন যাত্রী বসিবে। কিন্তু ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া আছে প্রায় জন পঞ্চাশ।

ভবানী এতক্ষণে বসিবার জায়গা পাইল পাশের এক বেঞ্চে। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু সরিয়া গিয়া তাহাকে জায়গা দিল। ভবানী তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া বসিল।

ভবানীর সামনের বেঞ্চে যে কয়জন বসিয়া আছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ যুবক কেহ বয়স্ক। সকলেই ডেলি প্যাসেঞ্জার। তাঁহারা ইতিমধ্যে বেশ গল্প জমাইয়া বসিয়াছেন।

বিপরীত দিকের বেঞ্চে সেই বৃদ্ধা মহিলাটি। পাশে একটি আট দশ বৎসরের বালক। তাহার পিছনে আরও গুটি তিনেক স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকদের সামনে যাহারা, তাহারা নিজেদেরই লোক; নিম্নশ্রেণীর ও পাড়াগাঁয়েরই হইবে। হাঁটুর উপর কাপড়। হাতে একটা করিয়া হুঁকা। ছাতা ও লাঠিকে একত্র করিয়া গামছা দিয়া তাহা বাঁধা রহিয়াছে। সকলেরই চেহারা কাল ও বিশ্রী।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভবানীকে কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশাই নামবেন কোথায়? আমাকে তো যেতে হবে অনেক দূর।

যে ভীড় আজ, তার ওপর গরমও অসহ্য! কি ক'রে সময়টা কাটাব তাই ভাব্ছি।"

ওধার হইতে মিহি গলায় কে যেন চ্যাঁচাইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। সকলেই অবাক হইয়া দেখিল কে একজন একটী হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সকলকে কি যেন দেখাইতেছে, আর বলিবার চেষ্টা করিতেছে।

একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ঐরে, আবার ঢুকেছে! একজন যেতে না যেতে আবার একজন এসে হাজির। ওদের অত্যাচারে আর পারা যায় না।"

শ্রীরামপুর ষ্টেসন আসিল। অনেক যাত্রী নামিল। অনেকে আবার নূতন দেখা দিল। বিবাহের একটি দল আসিয়া কামরাটী দখল করিয়া বসিল। বরযাত্রীর কতক অন্য ধারে বসিল। বোঝা গেল আর বাকী বরযাত্রীরা অন্য গাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে। যাহারা বরের নিতান্ত বন্ধু তাহারা সকলেই এই গাড়ীতে উঠিয়াছে।

বর তরুণ। বন্ধুরাও তরুণ। তাহার উপর বরযাত্রী। কাজেই তাহারা সমস্ত রাস্তা ইয়ারকি করিতে করিতে চলিয়াছে।

নববধূ সুন্দরী। একখানি লাল রঙের বেনারসী শাড়ী পড়িয়াছে। গহনায় সমস্ত শরীর মোড়া। এমন ভাবে বসিয়াছে যে মুখ দেখিবার উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে মুখ ফিরিয়া তাহার ভাইয়ের সঙ্গে দুই একটী করিয়া কি কথা বলিতেছে।

বরযাত্রীর দল ইতিমধ্যে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। একজন কোমরে চাদর জড়াইয়া বামহাত কোমরে দিয়া ডান হাত উপরে তুলিয়া

অপরূপ ভঙ্গিতে নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্গে বন্ধুরা আবার তাহাতে যোগ দিয়া অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি ভাবে খানিকক্ষণ চলিতে লাগিল। পর পর গোটা কয়েক ষ্টেসনে গাড়ী থামিয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ নামিয়াছে। নূতন যাত্রীও কেহ কেহ উঠিয়াছে।

বরযাত্রীদের কাণ্ড দেখিয়া সকলে অবাক। অবাক হইবার কথাই বটে! অন্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম। নব পরিণীতা বধূর সামনে নিজেরা বন্ধু হইয়া যে এরূপ কাণ্ড করিতে পারে তাহাতে কে অবাক না হইবে?

ট্রেন চন্দননগর ষ্টেসনে আসিল। গাড়ীর পাশ দিয়া নানান জিনিষ বিক্রয় করিবার জন্য ফেরিওয়ালারা ঘুরিতেছে।

'পাকা কলা' 'পাকা কলা' বলিয়া একজন ফেরিওয়ালা গাড়ীর দিকে মুখ বাড়াইতেই একজন চীৎকার করিয়া কলাওয়ালাকে ডাকিয়া কলা চাহিয়া দরদস্তর করিতে লাগিল। চন্দননগরে কলা প্রচুর পাওয়া যায়, সস্তাও বটে। কিন্তু কলার আকৃতি দেখিয়া সে আশা উড়িয়া গেল। আঙ্গুলের চেয়ে বড় ও মোটা নহে।

এদিকে ট্রেন ছাড়িতে আর বেশী দেরী নাই দেখিয়া কলাওয়ালা তাগাদা দিতে লাগিল। এক ছড়া কলা লওয়া হইল। একটা দুইটা করিয়া দিতে দিতে সে ছড়াটা ফুরাইয়া গেল। আবার এক ছড়ায় হাত পড়িল।

ট্রেন ছাড়িল। অগত্যা কলাওয়ালা গাড়ীতেই আশ্রয় লইল।

ভিতরে ততক্ষণ মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। নববধূর ভাইয়েরা কলা লইয়া একদিকে ভক্ষণ অন্যদিকে "আরও চাই আরও চাই" সুর তুলিয়া

দিয়াছে। এক বন্ধু একছড়া কলা লইয়া বন্ধুপত্নীকে অতি আদরের সঙ্গে দিতেই লজ্জায় নববধূ মুখ ফিরিয়া লইল।

বন্ধু তখন তাহার কোলের কাছে ফেলিয়া দিতেই নববধূ তাহা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। ফলে ইহা তাহার ভাইদের চোখে অসহ্য হইয়া উঠিল। একেতো তাহারা চাহিয়া কলা পাইতেছে না, আর তাহার দিদি ইচ্ছা করিয়াই কলা ছড়াটা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। কাজেই তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। ছোট ভাইটা দিদিকে বকিতে লাগিল। আর আপন মনে গজগল্প করিতে লাগিল।

বন্ধুরা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"বাঁদর হাঁকাহাকা!" তখন হইতে সকল কথায় নববধূকে উপলক্ষ্য করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে। নববধূর পক্ষে তাহা অসহ্য হইবার কথা। মধ্যে মধ্যে নববধূ ভাইদের মারফৎ, কখনও বা নিজেই তাহার উত্তর দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন কারণেই পারিয়া উঠিতেছে না। বেচারা পড়িয়াছে মুস্কিলে। যাহার সঙ্গে সে আসিয়াছে, তাহার মুখেও কোন কথা নাই। সে কেবল বন্ধুদের সঙ্গে তাল দিয়া চলিয়াছে। ভাইয়েরা কলা লইয়া ব্যস্ত। তাহাদিগকে কিছু বলিলে ঠিক ভাবে তাহারা বলিতে পারে না। অগত্যা হাতজোড় করিয়া নববধূ তাহাদিগকে গাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করে। ইহাতে তাহাদের হাসি আরও বাড়ে। তাহারা ঘন ঘন নববধূর সহিত কথা কহিতে চাহে এবং তাহাদেরই দিকে যেন সে তাকাইয়া থাকে ইহাও তাহারা ইচ্ছা করে।

একটা ছোট ষ্টেসনে বিবাহের দল নামিয়া গেল। নামিবার সময়েও তাহাদের উৎসাহের ও উত্তেজনার মাত্রা কিছুমাত্র কমে নাই। আর

কয়েকটা ষ্টেসন মাত্র। ষ্টেসন আসিলেই ভবানী আর এক মিনিট অপেক্ষা করিবে না। ঘড়ি দেখিয়া হিসাব করিল আর মাত্র এক ঘণ্টা সময়। ইহার মধ্যেই তাহার যাত্রাপথের ছেদ ঘটিবে। বিরহী বধূর সকল আশা সে পূরাইবে। তাহার দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত আশা মিটিবে। মিলনে পূর্ণানন্দ পাইবে। আর কিছু চায় না সে।

ভবানী আর ভাবিতে পারিল না। যে খবরের কাগজটা সে পাতিয়া বসিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। প্রথমে দেখিল বিজ্ঞাপন। বেঙ্গল কেমিকেল, হিমানী, হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স, এম-বি সরকার এণ্ড সন্স এবং আরও অনেক। তারপর আরম্ভ করিল কর্ম্মখালি। ইহাতে এমন কোন চাকুরীর আভাষ নাই যাহা তাহার কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয়ের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে। তারপর দেখিল বড় অক্ষরে লেখা আছে চীন জাপানের যুদ্ধ—চীনের শোচনীয় পরাজয়।—"যাক্‌গে যে হারলো সে হারলো আমার তাতে কি!" বলিয়া পর পর কয়েক পাতা উল্‌টাইতে হারান, নিরুদ্দেশ ইত্যাদি চোখে পড়িল।

এক যায়গায় লেখা আছে :—

ভাই অমর,

তুমি হঠাৎ না বলিয়া কেন চলিয়া গেলে সেজন্য আমরা সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। তোমার মা শয্যাশায়ী। দিবারাত্রি তোমার নাম করিয়া কাঁদিতেছে। তুমি না আসিলে তাঁহাকে বাঁচান শক্ত। তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক সংবাদ পাইলেই চলিয়া আসিবে। ইতি—

তোমার দাদা 'অমিয়'

নীচে আরও একটা কথা লেখা আছে। তাহাতে সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিয়া জানান হইয়াছে যে, যিনি অমরনাথ ঘোষকে (বয়স চৌদ্দ, রং ফরসা, বাম গণ্ডে তিল, মাথায় ছোট টাক) সন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাহাকে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। ঠিকানা লেখা আছে, অমিয়নাথ ঘোষ, শ্রীরামপুর।

ট্রেন একটী ছোট ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। মাত্র কয়েকজন যাত্রী উঠিল ও নামিল। মিনিটখানেক অপেক্ষা করিয়াই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। চল্‌তি ট্রেনে ক্রুম্যান উঠিল। ক্রুম্যানকে দেখিয়াই হউক বা নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসনে নামিবে বলিয়া হউক কে যেন দরজা খুলিয়া নামিবার আয়োজন করিতেই ক্রুম্যান ছুটিয়া আসিয়া লোকটার হাত চাপিয়া ধরিয়া এক টান দিতেই সে ছিটকাইয়া কামরার ভিতর পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া এমন বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া উঠিল যে, যাহাদের কাছে সে পড়িল তাহারা 'গেল, গেল, মরে গেল, জল, জল' করিয়া এক মহা অনর্থ বাধাইয়া দিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল।

অন্যান্য যাত্রীরাও ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

'জল! জল!' এ অবস্থায় জল পাওয়া যায় কি করিয়া। একজন পায়খানার ভিতর ঢুকিয়া জলকলের হাতা ঘুরাইয়া দেখিল এক বিন্দুও জল নাই। একজন বলিল "ট্রেন থামাও এখনও তো ট্রেন ষ্টেসন ছাড়ে নাই। ষ্টেসনে নিশ্চয়ই জল পাওয়া যাবে।"

ওপাশের এক ভদ্রলোক মুখে একখানা লুচি পুরিয়া তাহা চিবাইতে ছিলেন। তাহার পাশেই আছে জল। একঘটি জল।

পাশের একজন ভদ্রলোক উঠিয়া গিয়া আহাররত ভদ্রলোককে ধমক

দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আরে মশাই, এদিকে যে অবস্থা ক'রে তুলেছে তাতে আমরা অস্থির, আর আপনি নিশ্চিন্তে লুচি খাচ্ছেন। তা খান, তবে জলটা নিয়ে যাচ্ছি।"

চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়া যাহাকে বেঞ্চে বসাইল সে একটা ছোকরা। পরনে ছেঁড়া, ময়লা একখানা কাপড়, গায়ে যে জামাটা আছে তাহার সব জায়গাটাই ছেঁড়া ও ময়লা। মাথার চুল রুক্ষ, চেহারা পাতলা, চক্ষু কোঠরাগত, দেখিলে মনে হয় সদ্য অসুখ হইতে উঠিয়াছে।

এদিকের অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া ক্রুম্যান সিগ্‌ন্যাল টানিয়া দিয়াছে। ট্রেন যখন থামিল তখন সে ষ্টেসনের সীমানা সবে ছাড়িয়াছে মাত্র।

জানালা দিয়া সকলেই মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল কি ব্যাপার। তারপর আসিল গার্ড, ড্রাইভার। ট্রেন হঠাৎ থামিল দেখিয়া ষ্টেসনে যাহারা ছিল তাহারা ষ্টেসন মাষ্টারের সঙ্গে চলিয়া আসিল। গাড়ীতে ভিড় জমিয়া গেল।

ছোকরা তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। তবে তাহার হাটু, কনুই ও আর যে যে যায়গা ছিঁড়িয়া গিয়াছে সেইগুলি হইতে তখনও অল্প অল্প রক্ত পড়িতেছে। কে একজন আসিয়া তাহাকে দুইটা কমলা লেবু দিয়া গিয়াছে। সে একটি পাশে রাখিয়া অন্যটা খাইতে ব্যস্ত ও এদিক ওদিকে তাকাইতেছে। একজন ভিজা ন্যাকড়া দিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া মুছিয়া দিতেছে।

সকলকে সরাইয়া দিয়া গার্ড ছোকরাটীর কাছে গিয়া কি হইল দেখিতে লাগিল। ক্রুম্যান পাশে দাঁড়াইয়া তাহার বক্তব্য গার্ডকে শুনাইতেছিল। যে ভদ্রলোক ছোকরাটীর ক্ষত ধুইতেছিলেন তিনি

উঠিয়া ক্রুম্যানকে অনেক কথা শুনাইয়া দিলেন। বালক বলিয়াই সে চুপ করিয়া আছে। অন্য কেহ হইলে ক্রুম্যানকে বেশ শিখাইয়া দিত।

একজন বলিয়া উঠিলেন—"আহা গরীব ব্যাচারা, বোধ হয় কলকাতার কোন বাড়ীর ভৃত্য। জ্বর হয়েছে তাই ছুটি নিয়ে বাড়ী যাচ্ছিল; অসুখ শরীর, তার ওপর ছোট ছেলে ষ্টেসন চিন্‌তে পারে নাই। তারপর ট্রেন ছাড়লে হঠাৎ নজরে পড়েছে এই তাদের ষ্টেসন। তাই চলতি ট্রেনে নামতে যাচ্ছে এমন সময় ঐ মহাপ্রভুর নজরে পড়ে। উনি দিয়েছেন একটান! আর এই অবস্থা! নাও, এখন ঠ্যালা সামলাও!"

অনেকে অনেক কথাই বলিল। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলে। ট্রেনময় এক হুলুস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গেল।

ভবানী এতক্ষণ কোণের দিকে চুপ করিয়া বসিয়া ইহাই দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল মধ্যপথে কি এক অনর্থ ঘটিয়া গেল। সে চায় তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইতে। এখন যাহা ঘটিল তাহাতে ট্রেন এইখানেই সমস্ত বেলা কাটাইয়া দিবে। সামান্য একটা ব্যাপারে ট্রেন থামান মোটেই উচিত নয়। রেল কোম্পানী এদিকে লক্ষ্য রাখেন না কেন? ভবানীর মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল।

ঘটনাস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া একজন ভবানীর মুখের দিকে অবাক হইয়া তাকাইলেন। তারপর বলিয়া উঠিলেন—"আপনি কি রকম মশাই! ট্রেনের ভেতরে ঐ বড় কাণ্ড হয়ে গেল, আর আপনি এখানে চুপ-করে-বসে আছেন! যান, উঠুন, দেখে আসুন কি ব্যাপার হ'ল। আচ্ছা লোক মশাই আপনি। বাড়ীতো সকলেই যাব। কি বিপদটা হ'ল দেখতে গেলেন না একবার।"

—"কি আবার বিপদ, কই ?" বলিয়া একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে উঠিয়া ভবানী গার্ডের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। গার্ড তখন ছোকরাকে প্রশ্ন করিয়াছে, কোথেকে আসছিস, যাবি কোথায় ইত্যাদি।

ছোকরাও একে একে উত্তর দিয়া যায় আর এককোয়া করিয়া লেবু খায়।

ছোকরার চেহারা ও হাবভাব দেখিয়া ভবানীর মন ঘৃণায় ও রাগে ভরিয়া উঠিল। সে কেবলই মনে মনে বলিতে লাগিল—"এর জন্যেই এত গোলমাল, এত দেরী। কলকাতা থেকে আসছে অথচ একবারও চোখে পড়ল না। কিরকম ছোকরা। বাঁদর, বাঁদর, সত্য বাঁদর।"

ছোকরার কথাবার্ত্তায় গার্ডও চটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখের কাছে হাত লইয়া গিয়া গার্ড কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ষ্টেশনে নামবি, টিকিট আছে ?"

ছোকরার মুখ নীচু হইল। লেবুর যে কোয়াটা তখন মুখে ছিল তাহার বিচিগুলি সে ফেলিতে লাগিল। কোন কথা বলিল না।

ছোকরার মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া গার্ড সরোষে বলিয়া উঠিল— "টিকিট, টিকিট, টিকিট নাইতো, দাও ব্যাটাকে নামিয়ে।" ষ্টেসন মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া আবার বলিল—"নিয়ে যান মশাই ওটাকে। ভাড়া আদায় ক'রে তবে ছাড়বেন। নইলে একেবারে শ্রীঘরে পাঠিয়ে দেবেন।" তারপর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া— "উঃ, পনের মিনিট লেট। সরি চলুন, চলুন, আর না।" বলিয়া গার্ড নামিয়া পড়িল।

ভবানী এতক্ষণ ধরিয়া ছোকরাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন।

মাথার টাক ও বাম গণ্ডের তিল তাহার কেবলই চোখে পড়িতেছিল। পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল—"মশাই, জিজ্ঞেস করুন তো ওর নাম কি ?"

কিছুক্ষণ পরে উত্তর আসিল—অমর ঘোষ।

ভবানী আর কোন কথা না বলিয়া অমরের কাছে গিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"খোকা তোমার বাড়ী কোথায় ? যাবে কোথায় ?"

অমর সত্যই উত্তর দিল—"শ্রীরামপুর যাব।" সে আর কিছু বলিল না।

—"তোমার দাদার নাম অমিয় নয় ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"যাক্ বাঁচা গেল। মাত্র কুড়ি মিনিট দেরি তো। তা হোক্! মিনিটে পাঁচ টাকা লাভ। মন্দ কি ?"

এদিকে ষ্টেসনমাষ্টার পাশের একজন কুলিকে হুকুম দিল—"ছোকরাকে নামিয়ে নিয়ে চল।"

উত্তেজিত কণ্ঠে ভবানী বলিয়া উঠিল—"সাবধান, ও আমার লোক। ওর টিকিটের যা দাম লাগবে, সে সব দোব ষ্টেসনে; আমরা যে ষ্টেসনে নামব।"

ষ্টেসনমাষ্টার অবাক হইয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে আর যাহারা ছিলেন তাঁহারাও অবাক। সকলেই ভাবিতে লাগিল, ভদ্রলোক এতক্ষণ ছিলেন কোথায় ? সকলেই একবার ভবানীর দিকে একবার ছোকরাটীর দিকে তাকাইতে লাগিল।

ভবানী ক্রুম্যানের কাছে গিয়া তাহাকে যাহা বুঝাইয়া বলিল, ক্রুম্যান আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া তাহাতেই মত দিল।

ষ্টেসনমাষ্টার এবং আর যাহারা উঠিয়াছিল তাহারা সকলেই ক্রুম্যানের ইঙ্গিতে নামিয়া গেল।

গার্ড হুইসেল বাজাইয়া নীল পাখা দেখাইতে লাগিল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ভবানী একেবারে অমরের কাছে গিয়া বসিল। গাড়ীর ভিতরে তখনও হুলুস্থূল চলিতেছে।

ট্রেন বর্দ্ধমানের কয়েকটা ষ্টেসনের পর এক ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। ভবানী যাহাকে যাহা পারিল বুঝাইয়া দিয়া অমরকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী হইতে নামিল।

পাছে কোন গোলমাল করিয়া বসে এই ভয়ে ক্রুম্যানটী ভবানী ও অমরকে সঙ্গে লইয়া গেট পার করিয়া দিয়া আসিল। ভবানী অমরের অতিরিক্ত ভাড়ার কথা তুলিতেই ক্রুম্যান হাসিয়া তাহার নিজের অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল এবং এ কথাও বলিল যে, ভবিষ্যতে এজন্য যেন আর কোন গোলমাল না করিয়া বসেন।

"নমস্কার" বলিয়া ক্রুম্যান বিদায় লইল।

অমরকে সঙ্গে লইয়া ভবানী ষ্টেসন ছাড়িল। ষ্টেসনের কিছুদূরে দামোদর নদী। তাহার পশ্চাতে ইন্দ্রাণী গ্রামের পথে তাহারা চলিল। গ্রামটী ষ্টেসন হইতে বড় জোর দুই মাইল পথ হইবে।

ষ্টেসন ছাড়িয়া পল্লীপথে নদীর ধার দিয়া তাহারা চলিতে লাগিল। সূর্য্য তখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। গ্রামে যখন ঢুকিল তখন

তাহার শেষ রশ্মিটুকু ছড়াইয়া দিয়া সে পৃথিবীর কাছে বিদায় জানাইতেছে।

ভবানীর ছুটি তিন দিন মাত্র। এবার অনেকদিন পরে সে গ্রামে আসিয়াছে। গ্রামের অনেকের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিল। বিশ্বজিতের সঙ্গে রাস্তায় তাহার দেখা হইল। চন্দ্রনাথ বাজার করিয়া ফিরিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া ভবানী তাহাদের খোঁজ খবর লইল।

পরদিন সকালে সে দল বাঁধিয়া নদীতে স্নান করিতে গেল। সাঁতার কাটা তাহার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস আছে। কলিকাতায় কলের জলে স্নান করিয়া সে সুখ পাইত না। প্রাণ ভরিয়া নদীতে স্নান করিল। বালক বয়স পার হইলেও সে বৈকালে বেড়াইতে গিয়া বাগানের গাছের কাঁচা আম চুরি করিয়া পাড়িয়াছে। হৈ হৈ রৈ রৈ করা অভ্যাস এখনও সমান আছে। দুষ্টুমি বুদ্ধি যেন সব সময় তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ছুটি ফুরাইয়া গেলে ভবানী কলিকাতা অভিমুখে মুখে রওনা হইল। পথে শ্রীরামপুরে বালকটিকে তাহার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া সে গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

বিশ্বজিতের বাড়ীর অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাহার বাপ মা অল্প কয়েক দিন আগে-পিছু মারা গিয়াছেন। বিশ্বজিতের বিবাহ দিয়া আর বেশী দিন ছিলেন না। তাহাদের অবস্থা মোটামুটি ভালই। কিন্তু কবিতা লেখার নেশায় সে বাড়ীর কিছুই দেখিত না। এখন সমস্ত ঝক্কি তাহার উপর পরিলেও সে সংসারের কোন ধার ধারিত না। বালিকা-বধূ কনকলতা এত অল্প বয়সে যে ভাবে সংসারের কাজে পটুতা লাভ করিয়াছে তাহাতে বিশ্বজিত ভগবানকে ধন্যবাদ জানায়। কনকলতা কিছুতেই তাহার স্বামীকে সংসারে মন দেওয়াইতে পারিল না।

একদিন বিষন্ন মনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কনকলতা বিশ্বজিতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। বিশ্বজিতের কাণ্ড দেখিয়া তাহার মন হতাশায় ভরিয়া উঠিল। ভাবিল, এত করিয়া শিক্ষা দিয়াও যাহার কোন ফল হইল না, তাহাকে লইয়া আর কতদিন এই দুঃখ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইবে। মানুষ একবার দুইবার ভুল করে, বার বার ভুল করিয়াও যে নিজেকে সংশোধন করিতে পারে না তাহাকে লইয়া সে আর কতদিন এমন ভাবে চলিবে। চেয়ারের পিছনকার হাতলটা ধরিয়া কনকলতা জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বিশ্বজিতের মন তখন কোন এক অজানা দেশে গিয়া পড়িয়াছিল।

হয়তো কল্পনায় কোন বিরহী বা বিরহিণীর কথা, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় মেঘের লুকোচুরী খেলা, অমরাপুরীর রাজকন্যা, কুঞ্জের কুহু কেকা ধ্বনি, মলয় পবনের মৃদুল হিল্লোল লইয়া তন্ময় ছিল; হঠাৎ কাহার দীর্ঘশ্বাসে তাহার কল্পনার ঘোর কাটিয়া গেল। একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া আবার কল্পনাকে স্মরণ করিল।

পিছন ফিরিয়া তাকাইয়াও বিশ্বজিত তাহাকে গ্রাহ্য করিল না দেখিয়া কনকলতা ক্রোধে ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া পড়িল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা সে বলে নাই। বিশ্বজিতের কাণ্ডজ্ঞান লক্ষ্য করিতেছিল মাত্র। মনে করিল চীৎকার করিয়া তাহার কল্পনার ঘুমঘোর ভাঙ্গাইবে, কিন্তু অতি মাত্রায় রাগিয়া গেলে যাহা হয় তাহাই করিল। গম্ভীর ভাবে শুধু ডাকিল—"শুনলে, শুনছো?"

বিশ্বজিতের তন্ময়ভাব কাটিল। কনকলতার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া সে আদর জানাইবার ভাণ দেখাইল।

হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া কনকলতা সরোষে বলিয়া উঠিল—"বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পেলো নাকি? এমন করে আর কদ্দিন থাকবে?"

বিশ্বজিতের হঠাৎ মনে পড়িল, কনকলতা এতক্ষণ ধরিয়া তাহার কবিতা লেখাই দেখিতেছিল, তাই হয়তো ইহার ভিতর এমন কোন অংশ তাহার চোখে পড়িয়াছে যাহা নিতান্ত বিসদৃশ বা ভুল হইয়াছে। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কনকলতাকে হাত ধরিয়া বসাইতে বসাইতে বলিল—"দেখো, কোন খারাপ কিছু তোমার চোখে ঠেকলো নাকি? এ একেবারে নিছক বর্ণনা, প্রাণের আবেগ মাত্র! কোন ভুল ঠেকছে নাকি বলতো?"

—"কবিতায় ভুল নাই, তোমার মাথায় ভুল আছে।"

জীবন-মৃত্যু

—"এঁ্যা, বলো কি ?" বলিয়া বিশ্বজিত একবার মাথায় হাত বুলাইয়া বুঝিবা কোথায় ভুল আছে তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল।

—"তোমার ভুল কোথায় আছে দেখাই, এসো !" বলিয়া কনকলতা বিশ্বজিতের খাতা বন্ধ করিয়া দোয়াত কলম লইয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিবে, এমন সময় বিশ্বজিত তাহার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে করো কি ? করো কি ? ওটা যে আমার কবিতার খাতা, ওটা নাও কেন ? আমায় এক্ষুনি ঐ কবিতাটা শেষ করতেই হবে ! নইলে ভয়ানক মুস্কিল !"

সজোরে খাতাখানা ছিনাইয়া লইয়া কনকলতা সেখানা বাক্সের ভিতর পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া বিশ্বজিতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রুকুটি-কুটিল-কটাক্ষে বলিয়া ফেলিল—"দেখো, তোমার বড় বেশী বাড়াবাড়ি দেখছি ! তোমার কবিতা লেখাই ভুল হচ্ছে ! তুমি আমাদের দিকে একেবারেই তাকাও না। আমরা যে না খেয়ে মরতে বসেছি তাও দেখছি লক্ষ্য রাখতে ইচ্ছে করোনা। কবিতা নিয়ে কি ধুয়ে জল খাবো ? যতদিন বাবা ছিলেন, কবিতা গল্প লিখে বেশ কাটিয়েছ, তখনতো তোমায় কোন কথা বলিনি, কিন্তু তাঁর যাওয়ার পর থেকে তুমি যদি সংসার না দেখো কেবল ঐ সব যা তা নিয়ে থাকো, তাহলে আমরা করি কি, যাই কোথা ? শোন, তুমি এখুনি ঘোষেদের বাড়ী যাও, তাদের খাজনার টাকাটা দেবার কথা ছিল কবে, কেবল আলিস্যি করে যাওনি বলে পাওনি। আজ যদি এক্ষুনি না নিয়ে এসো তাহলে একেবারে উপোষ।"

—"আচ্ছা যাচ্ছি, এক্ষুনি গিয়েই তাদের টাকাটা সব নিয়ে আসছি। তবে আমার কবিতার খাতাটা ওখানে বাক্সবন্দী করে রাখলে চলবে না।

দিয়ে দাও, ওটাকে নিয়ে আর রহস্য করোনা বলছি! ঐ [redacted] ওকে বন্ধ করে রেখে আমাকে খাটালে কোন ফলই হবে না জেনো। ঐ আমার ব্রেন, ঐ আমার সব।" বলিয়া বিশ্বজিত হাত পাতিল।

—"ওসব রঙ্গ আর ভাল লাগে না। দিন দিন আমাদের অভাব বেড়ে যাচ্ছে। কিসে অভাব ঘোচে তার চেষ্টা করবে তা নয়, যত ঐ সব বাজে কবিতা লিখতে ভালও লাগে, মনও বসে? আমিতো ওসব ছাই দুচক্ষে দেখতে পারি না।"

—"দেখো, মিথ্যা কথা বলোনা। সেদিন যখন তোমাকে প্রথম আনলাম, কখনও বালিসে, কখনও বা তোমার কোলে মাথা রেখে যখন কবিতার পর কবিতা পড়ে যেতাম তখন তো কই একদিনও আমার লেখা খারাপ লাগতো না! একই লেখা খাতায় একবার পড়তাম, তারপর পত্রিকায় ছেপে বেরুলে আর একবার পড়তাম, তখনতো মুগ্ধ হয়ে আমার কবিতা শুনতে আর আমি যেন একটা কী তাই ভাবতে, না?"

—"সে যখন ছিলাম, তখন ছিলাম। বাবা সংসারের সব দেখা শোনা করতেন, মাথার ওপর একজন ছিলেন, কাজেই খেতাম, আর নির্ভাবনায় তোমার সঙ্গে আমোদ করতাম! তখন তাই ভাল লাগতো। কিন্তু এখন সংসারে ডুবে গেছি, সবই দেখছি অন্ধকারময়; কেবল অভাব আর অভাব! কবিতা শোনবার সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।"

—"তা না থাক্, তোমার আমার অবস্থা সেই এক রকমই। কবিতা না লিখলে আমার মন ভাল থাকে না, ঘুমও আসে না। খাতাখানা দাও, যেটা অর্দ্ধেক দূর লেখা হয়েছে, সেটা আজকে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে পাঠাবো বলে ঠিক করেছি। সত্যি যে কবিতাটা এতক্ষণ ধরে লিখ-

[illegible] খুবই ভাল হয়েছে। এসো, বসো, এই এক চেয়ারেই বসো, দেখো কি চমৎকার কবিতা হয়েছে। শুনলে আহার নিদ্রা সব ভুলে যাবে। কেবল মনে হবে আরও শুনি, আরও শুনি। এসো!" বলিয়া বিশ্বজিত কনকলতার দিকে হাত বাড়াইল।

বিশ্বজিতকে এক ধাক্কা দিয়া দলিতা ফণিনীর মত কনকলতা ফেলিয়া ফুলিয়া যেন তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। একসঙ্গে কতকগুলি তীব্র কর্কশ কথা শুনাইয়া শাসাইতে শাসাইতে সে চলিয়া গেল।

ইহার পর হইতে কনকলতার বেশ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। আকাশে মেঘের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ঝড় উঠিবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বারিবর্ষণ যে হইতে থাকিবে তাহার আভাষও পাওয়া যাইতেছে। কনকলতারূপ আকাশে মেঘ উঠিয়াছে। এক্ষনি চারিদিক অন্ধকার করিয়া এমন ঝড় বৃষ্টি আনিবে যে, বিশ্বজিতকে একেবারে ভাসাইয়া কাবু করিয়া দিবে। কনকলতার এই পরিবর্ত্তন বিশ্বজিত দেখিয়াও দেখে না।

বিশ্বজিত লক্ষ্য করে, তাহার খাতা পত্রের সন্ধান তো মিলেই না, উপরন্তু সাদা কাগজটুকরাও তাহার চোখে কচিৎ কখন পড়ে। গোপনে দোকান হইতে সাদা কাগজ আনিয়া রাখিলে দুই একদিনের মধ্যে তাহাও অদৃশ্য হয়। বিশ্বজিত ভাবিতে থাকে ঝড় উঠিবার পূর্ব্বলক্ষণ, স্তব্ধভাব! কনকলতা কি তবে আমার লেখার জন্য চটিয়া উঠিয়াছে। লেখা ছাড়াইবার জন্য সচেষ্টও হইয়াছে। হায়! এতদিন ধরিয়া যে কুহু কেকা মলয় পবন ও হৃদয় বিনিময় লইয়া কাটাইয়া আসিতেছি তাহার কি অবসান হইতে বসিয়াছে! আমার কবিত্ব শক্তিকে ধ্বংস করিবার কী ব্যর্থ প্রচেষ্টাই

না চলিতেছে! বিশ্বজিত উত্তেজনার আধিক্যে ঘরময় পায়চারি করিতে করিতে বলিয়া উঠিল—"নাঃ অসহ্য, আমার বিনাশ হয় সেও ভাল, কবিতা লেখা কিছুতেই ছাড়বো না! না লিখলে আমি আর একদণ্ডও বাঁচতে পারব না!" বিশ্বজিত ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে থাকে আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়া আকাশের দিকে তাকায়।

এমন সময় কি একটা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কনকলতা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বিশ্বজিতের অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। ব্যাপারটা সহজেই অনুমান করিয়া লইয়া কনকলতা বিশ্বজিতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একান্ত সন্নিকটে দেহের কোমলস্পর্শ দিয়া বিশ্বজিতের মনে অবস্থার সাময়িক পরিবর্ত্তন আনিবার চেষ্টা করিল। বিশ্বজিতকে জানিতে তাহার কিছুমাত্র বাকী নাই। উদাসী কবিচিত্তের হৃদয় কি করিয়া অধিকার করিতে হয় তাহা কনকলতা জানে। বিশ্বজিতের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া এমন ভঙ্গি দেখাইল যে, বাধ্য হইয়া বিশ্বজিতকে তাহার মুখের পানে তাকাইতে হইল। আর যায় কোথায়! কনকলতা তখন তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বিশ্বজিতের বাহুবন্ধনের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে।

কনকলতাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাহার মুখে চুম্বন দিতে দিতে বিশ্বজিত মোহে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। কনকলতাকে পাইয়া সে সব ভুলিয়া গেল।

বিশ্বজিতের বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অসংবৃত বস্ত্র পারিপাটি করিয়া ও শিথিল কবরী বাঁধিয়া লইয়া বিশ্বজিতের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুটে—"এসো, বিছানায় বসো, ক'দিন থেকে তোমাকে কতকগুলো কথা জানাব মনে ক'রে আসছি, সময় পায়নি ব'লে বলা হয়নি।

—দেখো ?" বলিয়া বিশ্বজিতকে বিছানায় বসাইয়া নিজে তাহার একান্ত সন্নিকটে গিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে বিশ্বজিত কনকলতাকে একেবারে কোলের মধ্যে বসাইয়া লইয়াছে। প্রাণের আবেগে কনকলতার মুখের কাছে মুখ লইয়া বলিতে লাগিল—"কথা বলবে, তা এতদিন বলোনি কেন ? না বলার বাধা আমি কি কিছু তোমার জন্যে রেখেছি ?"

—"দেখো, মাঝে মাঝে এ রকম ভাবে কাটান ভাল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যদি এমনি ভাবে কেটে যায় তাতেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু সব সময় একটা বিষয় নিয়ে থাকলে তাতে অন্য দিকে ক্ষতি হয়। কবিতা লেখো ক্ষতি নাই, কিন্তু সব সময় ঐ নিয়ে ভাবা, আলোচনা করা, লেখা, এ সব করলে অন্যদিক যে বাদ পড়ে যায়। যাঁরা কবি তাঁদের সংসারের প্রতি টান কম। তাঁরা প্রকৃতি, পুরুষ আর রূপ রস নিয়েই মত্ত ; এদিকে তাঁর সংসার অচল হ'তে বসে। কবিরা কাব্য রস নিয়ে দিনের পর দিন হয়তো না খেয়ে কাটাতে পারেন কিন্তু সংসারে আর যারা থাকে তারাতো আর সে রকম পারে না। কাজেই তাদের বড্ড কষ্ট হয়। তুমি কিছু মনে ক'রো না, আমরা ক'বছর থেকে বড্ড কষ্ট পাচ্ছি। পাছে বাধা পেয়ে তুমি মনে কষ্ট পাও এজন্যে তোমায় এতদিন বলিনি ; কিন্তু আমাদের মুখের পানে তাকিয়ে সংসারের দিকে মন দাও। একটা চাকরি বাকরি না হয় ব্যবসাদি কিছু করো। এতদিন তোমার কবিতা কত মন দিয়ে শুনেছি। আমার কোলে মাথা রেখে কতদিন তুমি কবিতা পড়েছ, সে আমাদের কত ভাল লাগতো। তখন মাথার ওপর একজন ছিলেন কিনা ? যাই হোক্ আমার কথা রাখো, একটা কিছু কর !"

—"কনক, তোমার কথাই ঠিক। যতদিন না তোমাদের কষ্ট ঘোচাতে পারব ততদিন আর কিছু লিখব না। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখতে পাবো, ভবিষ্যতে একজন কবি হবো এই মোহেই আমি এতদিন কাটিয়েছি। আর না! আমার খাতা-পত্তর সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছ এতে আমি খুবই খুসি। তা বেশ কাল থেকেই না হয় একটা কিছু করতে আরম্ভ করি!—বলো কি করবো?"

—"আচ্ছা, কি করা হবে আজ রাত্তিরে সব ভাবা যাবে।" বলিয়া কনকলতা হঠাৎ বিশ্বজিতের বাহু ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া গেল।

—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে," বলিয়া বিশ্বজিত বিছানা হইতে উঠিয়া কনকলতার পিছু ধরিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরপর দুই তিনটা ব্যবসা করিয়াও বিশ্বজিত কোন রকমে তাহা দাঁড় করাইতে পারিল না। অগত্যা সে শেষবারের জন্য চালের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল এবং এই ব্যবসাতেই তাহার বেশ লাভ হইতে লাগিল। কবিরা সাধারণতঃ অল্প পরিশ্রমী হন। মন সর্ব্বদা কুহু কেকা, মলয় পবন, হৃদয় বিনিময় লইয়াই ব্যস্ত থাকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে এমন ভাবে পাইয়া বসে যে আর অন্যদিকে মন দিবার সময় দেয় না। এই কবি-চিত্ত লইযাই বিশ্বজিত দুই তিনটা ব্যবসায় লাভ করিতে পারে নাই। এবার সে তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া চালের ব্যবসায়ে একান্তভাবে মনোযোগ দিয়াছে। সকাল সাতটায় আড়তে গিয়া বসে, বাড়ী ফেরে বারোটার পর ; আবার দুইটার সময় আড়তে যায়, ফেরে রাত্রি দশটায়। মধ্যে মধ্যে তাহাকে মফঃস্বলেও যাইতে হয়। আবার লক্ষ্য রাখিতেও হয় কোথায় ধানের দর কম, কোন্ ধান ভাল ইত্যাদি। প্রথম প্রথম অন্যান্য গ্রাম হইতে ঢেঁকিছাঁটা চাল আনিত। কলিকাতার মত জায়গায় ঢেঁকিছাঁটা চাল সরবরাহ করার মূল্য আছে। বাড়ী বাড়ী চাল সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়। অথচ তাহাতে লাভ বেশী থাকেনা। কাজেই তিন চার মাসের মধ্যে ব্যবসায় একটু উন্নতি দেখিয়া বিশ্বজিত নূতন মতলব করিয়া বসিল। সস্তাদরে ধান কিনিয়া লোক নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদের দ্বারা চাল তৈয়ারী করাইয়া বরাবর কলিকাতার আড়তে পাঠাইবার ব্যবস্থা

করিতে লাগিল। ইহাতে সুবিধা এই, মাল বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িতে লাগিল, অথচ তাহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হইতেছে কম। একসঙ্গে প্রচুর ধান পাওয়া যায়, কিন্তু চাল পাওয়া যায় না।

বৎসর খানেকের মধ্যে বিশ্বজিতের আড়ত প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল। লাভের অংশও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বিশ্বজিত এখন একজন মস্ত বড় ব্যবসায়ী। ইন্দ্রাণী গ্রামে যতগুলি ধানচালের আড়ত আছে তাহার মধ্যে ইহাই বড়। এতদিন ধরিয়া সে যে সাধনা করিয়া আসিয়াছিল, যাহা তাহার পক্ষে একান্তই কাম্য ছিল, অকস্মাৎ তাহা বিসর্জ্জন দিয়া সে মোটেই দুঃখিত হয় নাই। মুদ্রার মোহ এখন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কবিতার মোহ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে।

বিশ্বজিত সব সময় ধান চালের ব্যবসা লইয়া এত ব্যস্ত থাকে যে অন্য দিকে তাহার মন আদৌ পৌছে না। কবিতা লেখার কথা তো সে এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছে। বন্ধুরা, সম্পাদকগণ তাহার কবিতা, গল্প লেখা বন্ধ দেখিয়া ঠাট্টা করিতে ক্রটী করে না। বারবার জানায়, পয়সার মোহে সে কি অন্যায় না করিতেছে। ইহা সত্যই দুঃখের বিষয়। ভবিষ্যতে এজন্য তাহাকে অনুতপ্ত হইতেই হইবে।

বিশ্বজিত কোন উত্তরই দিত না; আপন মনে নিজের কাজ করিয়া যায়।

সময় সময় বন্ধুর দল বাসায় আসিয়া আড্ডা দিয়া যায়। কবিতা, গল্প লিখিবার জন্য উৎসাহ দিয়াও বিশ্বজিতের মুখে ঐ এক কথা শুনিতে পায় —সময়াভাব ও অনিচ্ছা প্রকাশ। এত করিয়াও যখন তাহার মতি ফিরাইবার কোন সুযোগ পাইত না তখন হতাশায় তাহাদের মন ভরিয়া উঠিত।

এই ভাবেই বিশ্বজিত তাহার ব্যবসা লইয়া সময় কাটাইত। একদিনও যাহার কলম লইয়া না বসিলে চলিত না, মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিত; সে যে কেমন করিয়া সুদীর্ঘ দশ বৎসর চুপ করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে ইহা ভাবিতেই বিশ্বজিতের মন চঞ্চল হইয়া উঠিত। কখনও বা লিখিতে বসিবার উপক্রম করিয়া আবার কেন যে লিখিবার প্রবৃত্তি হইত না তাহা ভাবিলেই সে বিস্মিত হইয়া যাইত। কখনও ভাবিত, সত্যই কি সে একেবারে লেখা ছাড়িয়া দিয়াছে। সুদীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে সে মাত্র চারিবার কলম ধরিয়াছে। বাল্যবন্ধু অভয় যে তাহাকে কবি বলিয়া বরাবর সুখ্যাতি করিয়া আসিত, তাহার বিবাহের সময় সে একরূপ জোর করিয়াই বাড়ী হইতে একখানি প্রীতি-উপহার লিখাইযা লইয়া গিয়াছে। ইহার মাস তিনেক পরে পাশের বাড়ীর এক মহিলা সম্পর্কে পিসিমা তাহার বোনঝির বিবাহের জন্য একখানি প্রীতি-উপহার স্বনামে লিখাইয়া লইয়া গিয়াছেন। পিসিমাকে বিশ্বজিত বরাবরই শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে। বিশ্বজিত বেশ ভাল কবিতা লিখিতে পারে বলিয়া তাহার পিসিমার ধারণা। এ ক্ষেত্রে কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছি বলিয়া তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া মোটেই সমীচীন হইবে না এবং পিসিমাও সে কথা শুনিবেন না জানিয়া বিশ্বজিতকে বাধ্য হইয়া একটি প্রীতি-উপহার লিখিয়া দিতে হইয়াছিল।

ইহার বছর তিনেক পরে পাড়ার কতকগুলি ছেলে আসিয়া বিশ্বজিতকে তাহাদের হাতের লেখা নূতন পত্রিকায় একটি কবিতা দিতে হইবে বলিয়া ধরে। বিশ্বজিত প্রথমে হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাহারা তাহা না শুনিয়া মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে আসিয়া ধন্না দিত। বিশ্বজিত বাড়ীতে

থাকিত খুব কম। যে সময়টা থাকিত সে সময়ে তাহাকে বসাইয়া কবিতা লেখান যায় না। তবুও দুরন্ত ছেলেরা তাহাকে বিব্রত করিতে ছাড়িত না। অগত্যা তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একদিন বিশ্বজিত স্পষ্টই বলিয়া বসিল, বাড়ীতে তাহার কাগজ কলম কিছুই থাকে না। কিন্তু যে সব ছেলেদের এই অল্প বয়স হইতে কবিতা-প্রীতি দেখা দিয়াছে তাহারা কি সহজে বিশ্বজিতকে ছাড়িবে? নাছোড়বান্দা দুরন্ত ছেলেরা তাহার পরদিন সময় ও সুযোগ বুঝিয়া থানকয়েক কাগজ লইয়া হাজির। বিশ্বজিত এতদূর ভাবিতে পারে নাই। ছেলেদের কাণ্ড দেখিয়া অবাক। অগত্যা সে সময় চাহিল। পাঁচ সাত দিন ঘুরাইয়াও তাহাদের উৎসাহের মাত্রা কম দেখিল না বলিয়া নিজেরই লজ্জা পাইতে লাগিল। প্রথম প্রথম বাড়া ঘোরাঘুরি করিয়া অবশেষে তাহারা বিশ্বজিতের আড়তে যাইতে লাগিল।

দামোদরের ধারে প্রকাণ্ড বাজার। চারিদিকের গ্রাম হইতে লোক আসিয়া ইন্দ্রাণী গ্রামের বাজারে বেচা-কেনা করিত। গ্রামের এই অংশ সব সময় জমজমাট থাকিত। বাজারের পাশে স্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরী এবং আরও অনেক কিছু থাকায় গ্রামের শ্রী বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ্বজিতের আড়ত বাড়ী হইতে পোয়াটেক পথ হইবে। উৎসাহী ছেলেরা সেই পোয়াটেক পথকে গ্রাহ্যই করিত না। হাসিতে খেলিতে তাহারা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া হাজির হইত, বিরক্ত করিত আবার গালিগালাজ করিলে নির্বিকার ভাবে হাসিত। এ হেন উৎসাহী ছেলেদের নিরুৎসাহ করিবার কোন পথই আর খুঁজিয়া পাইল না দেখিয়া অগত্যা বিশ্বজিত একদিন তাহাদের সম্মুখে বসিয়া একটী কবিতা লিখিয়া দিল। কবিতা

পাঠ করিয়া ছেলেদের দল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—“খুব ভাল হয়েছে, বিশুদা, খুব ভাল হয়েছে। তোমার কবিতাটাই আমরা প্রথমে রাখবো।”

কবিতা ভাল হইয়াছে শুনিয়া বিশ্বজিতের ইচ্ছা হইল আর একবার কবিতাটী পড়ে। দ্বিতীয়বার কবিতা পড়িয়া সত্যই সে নিজেই মুগ্ধ হইয়া গেল। চৌদ্দ-লাইনের একটী ছোট কবিতা এত অল্প সময়ের মধ্যে চালের আড়তে বসিয়া সে যে এমন সুন্দর ভাবে লিখিতে পারিবে সে ধারণাই তাহার মনে আসে না। আনন্দে বিশ্বজিতের মন নাচিয়া উঠিল। পূর্ব্বস্মৃতি একবার জাগিয়া উঠিল।

ইহার বছর তিন পরে অকস্মাৎ বাধ্য হইয়া একজনের একটা বিজ্ঞাপন লিখিয়া দিতে হয়। বিজ্ঞাপনটী অবশ্য কবিতায়। কবিতায় বলিয়া সংক্ষেপে নয়, প্রায় তিনশ লাইন হইবে। একটী কাহিনী আর কি!

তারপর আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে বিশ্বজিতকে আর কোন প্রকার কবিতা লিখিবার দুর্ভোগ পোহাইতে হয় নাই। তবে তাহার স্ত্রী মধ্যে মধ্যে তাহাকে কবিতা ও গল্প লেখার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিশ্বজিত ভাবিত, তাহার স্ত্রী বোধহয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার লেখা সম্বন্ধে এইরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ছাড়িবে না। কবিতা লিখিয়া যে মহা অন্যায় করা হইয়াছে তাহার জন্য স্ত্রীর নিকট হইতে ভৎ´সনা চিরকালই শুনিতে হইবে কি? একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিশ্বজিত কনকলতাকে বলিল—“কবিতা লিখে অন্যায় করেছি, সে জন্য ক্ষমা চাচ্ছি! দশ বছর ওসব ছেড়ে দিয়েছি, তবুও ওকথা

মাঝে মাঝে একবার ক'রে না তুললে কি তুমি থাকতে পারো না? তুমি এত অর্থপিশাচ, এত স্বার্থপর তা জানতাম না।"

কনকলতা দেখিল তাহার স্বামী এইবার তাহার উপর ভীষণ চটিয়াছে। সে যে এই কয় বৎসর ধরিয়া তাহার মনে কবিতা লেখার স্মৃতি জাগাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, তাহা ভুল বুঝিয়া অন্যায়ভাবে তাহার উপর চটিয়াছে। তাই তাহাকে সব কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে লাগিল। বলিল—"দেখো, তুমি আমার কথার মানে ধরতে পারছো না। এখন তুমি যদি গল্প কবিতা লেখো তাতে আমি ঠাট্টা করতে যাব কেন? তুমি সংসারের অবস্থা ফিরিয়েছ, এখন যা খুসী তাই কর না কেন? আমি মোটেই নিষেধ করবো না। আর তোমার লেখা বন্ধ করবার উদ্দেশ্যই যদি আমার থাকতো, তাহ'লে—আমি কি করেছি দেখবে?" বলিয়া বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে এক গাদা পত্রিকা বাহির করিয়া বিশ্বজিতের সামনে ফেলিয়া দিল।

কাগজগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বিশ্বজিত যাহা দেখিল তাহা সত্য সত্যই অবাক হইবার বিষয়। এই কয় বৎসরের মধ্যে গোপনে এত গল্প কবিতা কি করিয়া কনকলতা পাঠাইল! তবে কি সত্যই আমার কাব্য-প্রীতির উপর তাহার যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা আছে। এত চাপা মেয়ে সে!

বিশ্বজিতের লেখা খাতাগুলি এখনও অক্ষত অবস্থায় তাহার স্ত্রীর বাক্স মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া তাহারই অলক্ষ্যে সেগুলির অভিযান চলিয়াছে দেখিয়া বিশ্বজিতের মনে বিস্ময় জাগিয়া উঠিল। মন-চাঞ্চল্য দেখা দিলেও ধানচালের ব্যবসা তাহার শক্তিকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়াও যে তাহা জাগিতে পারে ইহা তাহার মনেই হইল না।

জীবন-মৃত্যু

সকাল নয়টায় আড়ত হইতে ফিরিয়া বিশ্বজিত বাড়ী আসিয়াছে। বিশেষ জরুরী মনে করিয়া বিছানায় বসিয়া সে খান কয়েক চিঠি লিখিতে লাগিল।

কি একটা কাজে কনকলতা ঘরে ঢুকিয়াছে। পিছন ফিরিয়া লিখনরত স্বামীকে দেখিতে পাইয়া হঠাৎ তাহার পূর্ব্বেকার কথা মনে পড়িয়া গেল। ঐ বিছানায় অমনি ভাবেই বসিয়া বসিয়া তাহার কবি-স্বামী কত গল্প কবিতাই না লিখিয়াছে। কত অমৃত উৎসই না তাহার কলম হইতে বাহির হইয়াছে। এতদিন পরে তাহার মনে কি সেই পূর্ব্বস্মৃতি আবার জাগিল। আস্তে আস্তে বিশ্বজিতের কাছে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার লেখার দিকে নজর দিল।

কনকলতাকে দেখিয়াও দেখিল না। বিশ্বজিত আপন মনে তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতে লাগিল।

—"চিঠি, চিঠি লেখা হচ্ছে? একটা কথা বলছি, শুনবে? আজ-কালকের মধ্যে একটা কবিতা লিখে দিতে হবে। 'শান্তি'তে পাঠাবার জন্যে সম্পাদক মশাই তোমাকে চিঠি দিয়েছেন।"

—"আঁ্যা কবিতা কি? লেখা তো ছেড়েই দিয়েছি!"

—"তা হবে না! দিতেই হবে? আমি আবার আর এক যায়গায় কথাও দিয়ে ফেলেছি। তাঁরা এখানে চিঠি দিয়েছিলেন কিনা?"

—"তা, কথা দিয়েছ, দাওগে, আমাকে আর ওর ভেতর টেনো না! তোমার কাছে তো অনেক লেখা ছিল তাই দাওগে না হয়?"

—"সে সব তো আর নাই, যা ছিল সব কাগজে বের হয়ে গ্যাছে। আপাততঃ আমার মুখরক্ষার জন্যে একটা কবিতা লিখে দিতেই হবে।"

—"ওসব হবে না, কি বিষয় নিয়ে লিখবো সে সব কি আর ছাই মনে আছে ?"

—"তা জানি না, যা হয় ক'রো, তোমার ঐ ব্যবসা নিয়ে যদি কিছু লিখতে পার তো একটা লিখে দিও।"

—"পাগল নাকি ? কবিতা লেখা ছেলে খেলা নয়। চালের ব্যবসা করতে গেলে কবিতা লেখা চলে না। ও একটা মস্ত বড় সাধনা। যার জন্যে যুগ যুগ ধরে তপস্যা করে আসতে হয়।"

কনকলতা আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তখন বিশ্বজিত ভাবিতে লাগিল, কি ভাবে তাহার কবি-জীবনের সমাধি হইয়া গেল। উদরান্নের জন্য মানুষকে কিনা করিতে হয়!

পাশের গাছটীতে একটি কাক বসিয়া বসিয়া আপন মনে নিজের ডানা ঠোকরাইতে ছিল। দূরে একজোড়া কপোত-কপোতী ক্রমাগত বক্ বকম্ কম্ করিয়া যাইতেছিল। অন্য দিকে তাহাদের দৃষ্টি ছিল না। সামনের আকাশ স্বচ্ছ। দামোদরের উপর দিয়া যেন একখণ্ড কাল মেঘ পাল তোলা নৌকার মত আলগা ভাবে উড়িয়া যাইতেছিল। বিশ্বজিত তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অবিনাশ বাড়ী আসে খুবই কম। তাহার সময় নাই এবং অফিসের কাজে ছুটি নাই বলিলেই হয়। ইহা ছাড়া দেশের উপর তাহার টান কম বলিলেও কথাটা মিথ্যা বলা হয় না। কলিকাতার উপর তাহার মায়া বসিয়াছে বড় বেশী। কলিকাতার আবহাওয়া তাহার ধাতে খাপ খাইয়া গিয়াছে বলিয়া পল্লীগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ সে বড় রাখিতে চায় না। ঠিক ইহার বিপরীত দেখা যায় তাহার পিতা অমরনাথের বেলায়। পিতা-পুত্রের মধ্যে এতবড় ব্যবধান সচরাচর চোখে পড়ে না। পল্লীর আবহাওয়া অমরনাথের অস্থিমজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিন একটানা দেশে থাকিয়াও কখনও বিদেশে যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। পল্লীর শ্যামল কোমল মায়াবৃত বনানী, নদীর জল, উন্মুক্ত প্রান্তর তাহার বড় প্রিয়। সে মনে করে, এমনিভাবেই যেন তাহার বাকী জীবনটুকু শেষ হয়।

কলিকাতায় তাহাদের নিজেদের বড় বাড়ী হইয়াছে। মোটর গাড়ী আছে। ঠাকুর চাকরের অভাব নাই তবুও যেন সেখানে কিছুদিন থাকিতে গেলে অমরনাথ হাঁপাইয়া উঠে। একটী একটী করিয়া তাহার সংসারে অনেকগুলি অতিথি আসিয়া জুটিয়াছে। বড় কমল তারপর লতিকা দেখা দিয়াছে। অমরনাথ সবচেয়ে এই দুইটিকে ভালবাসে বেশী। প্রথম ইহারা সময়ে সময়ে দেশে যায়। ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমার খোঁজখবর লয়

এবং পল্লীপ্রীতি তাহাদের তুলনায় আংশিকভাবেও লাভ করিয়াছে। কমল এবার এম-এ পাশ করিয়া ল পড়িতেছে। লতিকা পড়ে বি-এ তে। গ্রীষ্মাবকাশের দীর্ঘ ছুটি লইয়া তাহারা দেশে চলিয়াছে।

চপলার এবার যাওয়া হইল না। কয়দিন হইতে তাহার শরীর ভাল নাই। সব ঠিকঠাক করিয়াও অপ্রত্যাশিত কারণে তাহার দেশে যাওয়া হইল না।

লতিকা ঠাকুরমাকে আদর করিয়া বলে বৌদি। আর ঠাকুরদাদাকে বলে দাদা। ঠাকুরমা ভাল মানুষ। কোন কথায় তাহার বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় না। এত বয়স হইয়াছে তবুও সে যেন কণেবউ! লতিকাকে বলে ঠাকুরঝি এবং এ নাম লতিকারই দেওয়া।

দিনকয়েক কাটাইয়া একদিন লতিকা ও কমল যুক্তি করিয়া অমরনাথের ঘরে ঢুকিল। অমরনাথ তখন বিছানায় আড়ভাবে শুইয়া গড়গড়া টানিয়া যাইতেছিল।

লতিকাকে দেখিয়া অমরনাথ সহাস্যে বলিয়া উঠিল—"এসো, এসো বৌঠাকরুণ! তোমার কথাই ভাবছিলাম। তা শালাটাকে সঙ্গে আনলে কেন? ও ব্যাটা অন্দরে ঢোকে কেন? গলা ঝাঁকারি নাই, কাশির শব্দ নাই, দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ নাই! হড়্‌মড়্‌ ক'রে এসে ঢুকে পড়লেই হ'ল। এসোতো, দেখি তোমার কাণটা কত বড়! শাস্তি না দিলে হবে না দেখচি!"

লতিকা ও কমল একসঙ্গে জোরে জোরে হাসতে লাগল।

—"কি সংবাদ ঠাকরুণ?" বলিয়া অমরনাথ বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল।

লতিকা ও কমল আসিয়া চুপি চুপি তাহার বিছানায় বসিয়া এক নিমেষে পরস্পরের মধ্যে ইঙ্গিত শেষ করিয়া লইল। ভাল মানুষের মতো বসিয়া ঘরের এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল আর কটাক্ষে ঠাকুর-দাদাকে দেখিতে লাগিল।

অমরনাথ তাহাদের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিল। পরে বলিল—"কিছু যুক্তিটুক্তি ক'রে এসেছ না কি? মতলব কি বলতো?"

লতিকাই কথা তুলিল—"দাদু, এবার আমরা মতলব করেছি, তোমায় কলকাতা নিয়ে যাব। সেখানে এমন ব্যবস্থা ক'রে রাখব—সে আর বলবার নয়?"

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল—"এক্ষুনি, আজই, বেশ চলো।"

—"না, আজ নয়! তবে শীগ্‌গিরি!"

—"না আজই চলো?" বলিয়া অমরনাথ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

অমরনাথের গম্ভীরভাব দেখিয়া লতিকা ও কমল চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কমল বলিল—"আচ্ছা দাদু, কলকাতা যেতে তোমার অত ভয় কেন? সেখানে অভাব কি?"

—"সে সব তোরা বুঝবি না? আমার ভাল লাগে না তাই যাই না! তোরা মধ্যে মধ্যে আসিস তাহলেই হ'ল।"

—"তুমি যদি একবারও না যাও তা'হলে আর আমরা কেউ আসব না।"

—"আচ্ছা, তোরা রাগ করিসনে! আসছে মাসে নিশ্চয়ই যাব! এখন এখানে কাজ কতো? এসব সেরে না গেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে! দেখবে শুনবে কে?"

—"ওসবের জন্যে ভাবতে হবে না। এবার তুমি চলো? আমরা সব ব্যবস্থা করে দেবো।"

—"তাহলেই হ'ল, তোরা সব করবি।"

—"দেখে নিও!"

—"দেখেছি সব।" বলিয়া অমরনাথ আবার গম্ভীর হইল।

কমল দাদুর আরও সন্নিকটে গিয়া প্রশ্নটাকে আরও সহজ করিয়া বলিল—"মোটকথা আমাদিকে দাদুর ভাল লাগে না। বাবাকে, মাকে, কাকেও না।" তারপর মুখ ফিরাইয়া লইয়া ক্ষুণ্ণভাবে বসিয়া রহিল।

কমলকে ক্ষুণ্ণভাবে মুখ ফিরাইয়া বসিতে দেখিয়া অমরনাথের দুঃখ হইল। সে কমলের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"না ভাই তোদের কারও ওপর আমার টান কম নাই। তবে কিনা সহর, ঐ ঘিঞ্জি যায়গায় আমি মোটেই থাকৃতে পারি না। কি রকম হাঁফ ধরে যায়! আর তাছাড়া আমি এখানে থাকলে তোদের এ গাঁয়ের ওপর মায়া পড়বে। যে রকম দেখছি তোদের মতিগতি, তাতে আমি মরে গেলে তোরা এ মুখোই হবি না।"

কমল ও লতিকা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"কে বল্লে, কে বল্লে? তাই যদি হ'তো তাহলে এত ঘন ঘন আমরা আসতাম না দাদু!"

—"সেই তো ভাল! তোরা আয়! তোদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ ক'রে বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে নিই!"

—"বাবা বলেন, আমরা ঘন ঘন এখানে এলে, পড়াশোনার ক্ষতি হবে। তাছাড়া রোদে রোদে বেড়ালে শরীরও খারাপ হবে।"

—"ওসব বাজে কথা! আমরা কি পড়াশোনা করি নাই। কলকাতায়

থেকে চাকরী করি নাই। আমাদের সময় আমিই এখানকার প্রথম লোক যে কলকাতায় চাকরী করে।"

—"সে কথা অস্বীকার করি না! কিন্তু তাই জন্যে বলি, কলকাতার ওপর তোমার অত অশ্রদ্ধা কেন? ইন্দ্রাণী গাঁয়ে এমন কি রস আছে যা ছেড়ে তোমার কোথাও মন বসে না।"

—"সে তোরা কি বুঝবি! আমি যা পারি না, তা পারি না!"

লতিকা জোর দিয়া বলিল—"যাই হ'ক, আমরা স্পষ্ট জানতে চাই তুমি আমাদের সঙ্গে কলকাতা যাবে কি না?"

—"যাব, যাব, এই আসছে মাসে নিশ্চয়ই তোদের ওখানে যাব। দেখে নিস তখন। আমার তো অচেনা যায়গা নয় যে তোদের হাত ধরে যেতে হ'বে। ঠিক তখন গিয়ে হাজির হবো দেখে নিস।"

—"আর তোমায় কিছু বলবো না, ইচ্ছা হয় যেয়ো না হয় যেও না। এসো দাদা আমরা এবার ঠাক্‌মাকে নিয়ে যাই! দেখি বুড়ো একলা কি ক'রে এখানে পড়ে থাকে।" বলিয়া লতিকা কমলকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

অমরনাথ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার অতি বড় আদরের নাতি-নাতিনীরা এত করিয়াও তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে না পারিয়া অগত্যা অন্যকে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক! হয়তো এজন্য তাহাদের মনে খুবই দুঃখ হইবে। তাহারা ভাবিবে অনেক কিছু—বলিতে পারে এমন পাড়াগাঁয়ে লোক আর কখনও দেখিনি।—"নাঃ এরা দেখছি নাছোড়বান্দা।" বলিয়া অমরনাথ বিছানা ছাড়িয়া উঠিল, তারপর বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

এদিকে কমল ও লতিকা ঠাকুরমাকে গিয়া ধরিয়াছে তাহাকে কলিকাতা যাইতেই হইবে। চপলা তৎক্ষণাৎ রাজি। বলিল—"আমাকে নিয়েতো লাভ নাই। তোমাদের দাদুকে নিয়ে যাও—যে যেতে চায় না ঘর ছেড়ে! এমন গেঁয়ো মানুষ কখনও দেখিনি। বাড়ী আর বাড়ী! এক রাত্তির বাইরে গেলে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে যেন ওর। ওকে ধরে নিয়ে যাও। কেন যাবে না? আমিও বলছি চলো।"

তিনজনে বসিয়া বসিয়া অমরনাথকে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার দিকে আকাশ আঁধার করিয়া কালো মেঘ দেখা দিল। চপলা রান্নাঘরে বসিয়া রাঁধিতেছিল। কমল ও লতিকা আসন্ন বৃষ্টির ভয়ে ছুটীতে ছুটীতে আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। ঠাকুরমার কাছে গিয়া উনুনের ধারে গিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া পড়িল। ভয়ে দুইজনের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে ঘন অন্ধকার তাহার উপর বজ্রনাদ ও বৃষ্টিতে ইহাদের মুখে আর কথা সরে না। ঠাকুরমাকে আশ্রয় করিয়া কতক নিশ্চিন্ত হইল।

ঘনঘটা করিয়া মেঘের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আকাশ চিঁড়িয়া যেন বৃষ্টি নামিল ধরায়। দেখিতে দেখিতে সকলে মিলিয়া তাণ্ডব-নৃত্য জুড়িয়া দিল। কমল ও লতিকা উনুনের ধারে ঠাকুরমার দুইপাশ ঘেঁসিয়া বসিল।

এই দারুণ বৃষ্টির মধ্যে জনকয়েক মাথায় ছাতা, হাতে লণ্ঠন ও জালি লইয়া মাছ ধরিবার জন্য বাহির হইয়াছে। জলের ঝাপটা সহিয়া একহাঁটু

জলের ভিতর দিয়া তাহারা দলে দলে চলিয়াছে নদীর দিকে। ইহার উপর তাহারা মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে। লতিকা কমলকে টিপিয়া বলিল—"এ সময় ভয়ে আমরা মরছি, ওদিকে ওরা মনের আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। ধন্য বটে ওরা!"

—"ওদের যে মজা হবে, মাছ পাবে অনেক। এই জলে পুকুরের মাছ সব উঠে আসবে, আর ওরা ধরবে, তাই এত আনন্দ।"

তিনজনের মধ্যে নানা গল্প চলিতে লাগিল। হাসি, ঠাট্টা কত কি আরম্ভ হইল। যে কয়দিন ইহারা আসিয়াছে চপলার আনন্দের আর অন্ত নাই। ইহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে বলিতে সে যেন তরুণী হইয়া গেল। বাল্যকালের বহু স্মৃতি সবই একে একে তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

লতিকা বলিয়া উঠিল—"বৌদি, দাদার সঙ্গে তোমার নাকি দু'বার ধরে বিয়ে হয়! সে বড় মজার কথা! আর একবার সে ঘটনা বলো না? দাদা নতুন বিয়ে করতে গিয়ে কেমন করে তোমায় আবার নিয়ে আসে সেই সব কথা।"

চপলা আস্তে আস্তে সেকালের সব কথা বলিতে লাগিল। সে যেন কতদিনের ঘটনা! কিন্তু চোখের সামনে তাহা আবার জ্বল জ্বল করিয়া ভাসিয়া উঠিল।

কমল বলিল—"তোমারও নাকি আর একজনের সঙ্গে বিয়ের ঠিকঠাক হয়েছিল? হ্যাঁ ঠাকুমা সে আবার কি?"

—"হুঁ" বলিয়া চপলা হাসিয়া ফেলিল।

—"তাহলে আর তোমাকে পেতাম না।" বলিতেই কমলের বড়ই দুঃখ হইল। চপলার পানে ছল ছল চোখে চাহিয়া রহিল।

—"তাহলে আমরাই বা আসতাম কোত্থেকে ?" বলিয়া লতিকা হাসিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, এই বাড়ী, কলিকাতার বাড়ী, মা, বাপ, ভাই বোনেরা আসিত কোথা হইতে ? হয়তো আর একদল ছেলেমেয়েতে এই বাড়ী মুখরিত করিয়া রাখিত। তাহাদের কথা কেহই ভাবিত না। কিন্তু দাদু কি তাহা করিতে পারিত ? তাহাদের ফেলিয়া, ঠাকুমাকে ফেলিয়া আবার কাহাকে ধরিয়া আনিয়া নতুন সংসার পাতাইত!—দাদু তাহা পারে! তাহার টান মোটেই নাই। ইত্যাদি নানা কথা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আসিয়া লতিকার মনে ঘা দিতে লাগিল।

চপলা অনেক গল্প করিল, পুরাতন বহু স্মৃতি এই দুই কিশোর-কিশোরীর সামনে টানিয়া আনিল। বৃষ্টি তখনও সমানে চলিতেছে।

অবশেষে অমরনাথকে সেবারের জন্য কলিকাতায় যাইতেই হইল। কিন্তু সর্ত্ত রহিল, দশদিনের বেশী এবার সে থাকিতে পারিবে না। পরের বারে গিয়া অনেকদিন থাকিবে—যতদিন তাহারা ইচ্ছা করে।

ট্রেনে বসিয়া কমল প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা দাদু, গাঁয়ের মায়া কি তুমি কিছুতেই ছাড়তে পারো না ?"

অমরনাথ গম্ভীর হইয়া বলিল—"দেখো, আমার কলকাতা যেতে আপত্তি নেই! কিন্তু যারা একবার কলকাতা যায়, সেখানকার জল বাতাসের স্বাদ পায় তারা সহজে এই এঁদো পাড়াগাঁয়ের দিকে পা দিতে চায় না। দেখোনা—আমার অবিনাশ! পাড়াগাঁয়ের যে কি মোহ সে তোমরা বুঝবে না! তোমরা পাড়াগাঁকে ভালবাস না। নেহাৎ আমরা দুই বুড়োবুড়ি আছি তাই এক একবার আমোদ করতে বা

চেঞ্জে আসতে ইচ্ছে করো। আমরা গেলে এই ভিটেতে প্রদীপ দেবার কেউ থাকবে না। তাই মনে করচি যতদিন বেঁচে আছি নিজের কর্ত্তব্য করে যাই! আর তোমাদের জন্যে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত আগে থেকে ক'রে রাখি! পল্লীমা আমার যেন তোমাদের ওপর অভিসম্পাত না দেয়। সবাই যদি এমনি ক'রে দেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে দেশের ভিটে নষ্ট হবে যে! সোণার গ্রাম ধ্বংশ হ'য়ে যাবে যে! বাঙ্গালার পল্লী বড় মোহের জিনিষ, বড় সুন্দর। তোমরা বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ, তোমাদের পল্লীপ্রীতির একান্ত দরকার—যেখানে কোটী কোটী লোক বাস করচে।"

এতগুলি কথা বলিয়া অমরনাথ গাড়ীর জানালা দিয়া আকাশের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কমল ও লতিকা অমরনাথের মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দশদিনের যায়গায় অমরনাথকে দেড়মাস কলিকাতায় থাকিতে হইল। নাতি-নাতিনীদের আদরে আবদারে তাহাকে এ কয়দিন বাধ্য হইয়া কাটাইতে হইল। অবশেষে নানা ছল-ছুতায় গ্রামে আসিতে হইল। এবার সঙ্গে আসিল শেফালী।

গিরিরাণী আশ্রমের দেখা-শোনার ভার ছিল বিষ্ণুদাসের উপর। সে তাহার বৈষ্ণবীকে লইয়া এতদিন নির্ভাবনায় ও নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতে-ছিল। অকস্মাৎ বিষ্ণুদাসের মৃত্যুতে আশ্রমের অব্যবস্থা ঘটিতে লাগিল। বিষ্ণুদাসের বৈষ্ণবী বেশীদিন অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে না করিয়া একজনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সরিয়া পড়িয়াছে। অগত্যা চন্দ্রনাথের উপর দেখা-শোনার ভার দিয়া গেল শেফালী। অবশ্য অনেকে এসময় চন্দ্রনাথকে বলিতেছে একজনকে দোসর করিয়া লইতে, কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহাতে রাজী নয়। সে আর সংসারী হইতে অথবা একান্ত পক্ষে আশ্রমী সংসারী হইতে কিছুতেই রাজী নয়।

চন্দ্রনাথ সব সময় আশ্রমেই থাকে। সকালে উঠিয়া দামোদরে স্নান সারিয়া পূজা-অর্চ্চনায় বসে। তারপর ফুল বাগান দেখা শোনা করে। একজন দুইজন করিয়া গ্রামের অনেকে প্রায়ই আসা যাওয়া করে। গ্রামের সকলেই চন্দ্রনাথকে স্নেহ করে। তাহার নিষ্ঠা দেখিয়া স্নেহ করিতে ইচ্ছাও হয়। সেও চায় শেষ বয়সে যেন এই ভাবে ভগবান চিন্তায় তাহার

জীবন শেষ হয়। তাহার দেশ নাই, বাড়ী ঘর নাই, এখন সব কিছু এইখানেই হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে কাহারও জন্য ভাবিতে হইবে না।

অমরনাথ মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া যায়। কমল ও লতিকা দেশে আসিলেই প্রায় সেখানে বেড়াইতে যাইত।

নদীর ধারে মনোরম স্থানে এই আশ্রমটী গড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রামের কলরোল সেখানে গিয়া পৌঁছায় না। একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করে। একদিন যেখানে শ্যামা মায়ের অট্টহাস্য ও রুদ্ররূপের ভয়ে ওধার দিয়া গ্রামের কেহ বড় একটা যাইতে সাহস করিত না, দিবারাত্রি ভীষণ রুক্ষ একটা ভাব বিরাজ করিত; এখন সেখানে মহিমময় শান্তি ফুলের সৌগন্ধের সঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়। এই রমণীয় ও লোভনীয় স্থানের জন্য সকলেই শেফালীর সতীন-প্রীতির প্রশংসা করে। এদেশে আদৌ ইহা দেখা যায় না বলিয়াই সকলের ধারণা। যাহা হউক আশ্রমটী এখন চন্দ্রনাথের ঐকান্তিক চেষ্টায় দিন দিন আরও মনোরম ও শান্তিপ্রদ হইতেছে।

ভবানী কলিকাতা হইতে একদল বন্ধু সঙ্গে আনিয়া থিয়েটারের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছে। ক্লাব ঘরে দিনরাত ধরিয়া হল্লা বৈঠক চলিতেছে। বিশ্বজিতকে সন্ধ্যার দিকে সেখানে যাইতে হয় একবার করিয়া নইলে তাহার বাকী রাখিবে না। কনকলতা দিন কয়েকের জন্য বাপের বাড়ী গিয়াছে। কাজেই বিশ্বজিতের কোন ভাবনা নাই আপাততঃ। কমল আসিয়া জুটিয়াছে। ভবানীর ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে ভবানীর এই সব আয়োজন।

জীবন-মৃত্যু

গ্রামের হেডমাষ্টার মহাশয়ের ছোকরা বয়স। সে সম্প্রতি এখানে আসিয়াছে। থিয়েটারে তাহার উৎসাহ বরাবরই ছিল। আরও কয়েক-জন স্থানীয় মাষ্টার ইহাতে যোগ দিয়াছে।

কলিকাতার বন্ধু মহলের ঝোঁক হইয়াছে গ্রাম দেখিতে। ইন্দ্রাণী গ্রামখানি মন্দ নয়। নদীর ধারে বাজার দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। গ্রামখানি দামোদরের ধারে ধারে লম্বা ভাবে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। চওড়ায় বেশী নয়। দামোদরের প্রকাণ্ড বাঁধ গ্রামখানিকে বন্যার হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নদীর ধারে ধারে বাঁধের গায়ে গায়ে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ইহাই সব চেয়ে বড় ও সদর রাস্তা। এপারের পার ঘাটের উপর প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ বহু প্রাচীন স্মৃতি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার তলায় বহু দেশের বহু রকমের লোক আসিয়া আশ্রয় লয়। তারপর বেচা কেনা করিয়া আবার চলিয়া যায়। সব সময় পথিকের গুঞ্জন শোনা যায় গাছটার নীচে। গাড়ী, গরু ও মহিষের কলরবে গাছতলা উচ্ছ্বাসময় হইয়া থাকে সব সময়।

ছেলের দল পার-ঘাট দেখিয়া বাজারের ভিতর ঢুকিল। সারি সারি কতকগুলি চালা ঘরের সমষ্টি ও একটা প্রকাণ্ড ময়দান লইয়া বাজারের সীমানা এবং তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে কয়েক সারি করিয়া দোকান বসিয়াছে। বিভিন্ন রকমের দোকান। বিশ্বজিতের চালের আড়ত সব শেষে এবং ইহাই সব চেয়ে বড়। এ অঞ্চলে ইহার প্রসার বাড়িয়াছে খুব বেশী।

বাজার ও দোকান পসারী দেখিয়া তাহারা নদীর ধারে ধারে বড় রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। এক পাশে নদী অন্য পাশে সারি বাঁধিয়া বসতি।

কোনটী পাকা কোনটী কাঁচা। অধিকাংশই মেটে ঘর, তবে দাওয়া বাঁধান। এই পাড়ায় বণিক সম্প্রদায়ের বাস বেশী। পাশে কতকগুলি স্বর্ণকার বাস করে। ইহার পর ব্রাহ্মণ-পাড়া, কায়স্থ-পাড়া নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই অঞ্চলকে সকলেই ভদ্রপাড়া বলে। কিছু দূরে অন্যান্য জাতির বাস এবং তাহার পরে মুসলমান-পাড়া। এই পাড়ার বসতি অত্যন্ত ঘন এবং অত্যন্ত নোংরা বলিয়া ইহার অখ্যাতি আছে। গ্রামের লোকেরাই ইহা করিয়া থাকে।

গ্রামখানি বেশ গোছালো এবং শ্রীসম্পন্ন। এদিক দেখিয়া তাহারা আবার ফিরিল। পার-ঘাট ও বাজারে আসিয়া আবার পশ্চিম মুখে চলিল। এই দিকটা নির্জ্জন এবং বিস্তৃত। প্রকাণ্ড খেলার মাঠ লইয়া বিদ্যালয়। অদূরে ক্লাব ঘর এবং কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাস। ইহারা সকলেই বিদেশী। স্থানটী মনোরম বলিয়া কর্ম্মান্তে অবসর লইয়া এই নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে ঘর-বাড়ী করিয়া বাস করিতেছে। সব গুলি একতালা ও পাকা বাড়ী। সামনে নদীতীরে গিরিরাণী আশ্রম।

ভবানী ঘটকের খামার বাড়ীতে থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছে। যায়গা বড় কিন্তু ষ্টেজ ছোট। খানকয়েক বাঁশ দিয়া চারিদিক কাপড় ও ত্রিপল দিয়া ঘিরিয়া তাহার সীমানা করা হইয়াছে। ষ্টেজের ভিতর খান দশেক সিন ও সেই মত উইংস আছে। ড্রপসিনে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার ছবি। পাশে কণ্বমুণির আশ্রম। অদূরে একটি হরিণ চড়িয়া বেড়াইতেছে। এই সিনখানি ভাল কিন্তু পুরাণো হওয়ার দরুণ তাহার পূর্ব্বেকার সে জৌলুস আর নাই।

কলিকাতা হইতে যাহারা আসিয়াছে তাহারা প্রধান প্রধান ভূমিকায় নামিয়াছে। অভিনয় হইতেছে সিরাজদ্দৌলা নাটকের। ভবানী ভাল বক্তৃতা করিতে পারে। তাহার ভাই তারক স্ত্রীভূমিকায় পাঠ করিতে ওস্তাদ। যেমন তাহার গলা তেমনি সুঠাম ভঙ্গিমা। অভিনয় করিবার সময় সাধারণতঃ চেনা যায় না পুরুষ কি মহিলা বলিয়া।

পল্লীগ্রামে থিয়েটার ক্বচিৎ হয়। কোন বিশেষ উপলক্ষে। মধ্যে মধ্যে থিয়েটার হইলে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের উৎসাহের অন্ত থাকে না। মেয়েরা কতক পর্দ্দার আড়ালে কতক আশে-পাশে বসিয়া মনোযোগ দিয়া দেখে আর তাহাদের কচি-কাচা ছেলে-মেয়েরা পাশে শুইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে থাকে।

প্রকাণ্ড উঠানে সামিয়ানা টাঙ্গান হইয়াছে। সেখানে সন্ধ্যা হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার দল আসিয়া জুটিতেছে। অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষীরা সামিয়ানায় ধারে ধারে এক এক আঁটি খড় পাতিয়া বসিয়াছে দল বাঁধিয়া। কোন দল আসিয়াছে এক ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে, কোন দল দুই ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে আর অনেকে গ্রামেরই। সামিয়ানার মধ্যে সতরঞ্চি পাতা। বড় বড় মাতুরও বিছাইয়া রাখা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ডে-লাইট জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ষ্টেজের ভিতর কয়েকটা গ্যাস ও একটা বড় ডে-লাইট। ইহাতেই যথেষ্ট আলো হয়।

চারিদিক হইতে তামাকের গন্ধ, বিড়ির গন্ধ ধোঁয়া ছড়াইয়া আসর সরগরম করিতেছে।

জমীদার বাড়ীর অনেকেই আসিয়াছে থিয়েটার দেখিতে। তাহাদের বাড়ীর অপ্রকাশের থিয়েটারের উপর ভীষণ ঝোঁক; সে ষ্টেজের দেখা-

শোনার ভার লইয়াছে। এই ষ্টেজে গ্রামের অনেক ছেলের সাহায্য থাকিলেও জমীদার বাড়ীর সাহায্যই বেশী। তাঁহাদের ঠাকুর বাড়ীর দালানে ষ্টেজের সরঞ্জামগুলি ঝুলিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ঠাকুর বাড়ীতে থিয়েটার হয়। তাহাদের উৎসাহ বেশী সুতরাং ইহার কর্ত্তৃত্বভার তাহাদের উপরেই পড়িয়াছে।

অপ্রকাশ বক্তৃতা করিতে পারে না। কখন কখনও বড় বড় রাজার অভিনয় করে যদি তাহার বক্তৃতা খুব সামান্যই থাকে। কিন্তু অপ্রকাশের ভাই সুপ্রকাশ ভাল বক্তৃতা করে। কিন্তু সে বিদেশে চাকুরী করে বলিয়া তাহার বেশী উৎসাহ প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায় না। ভবানী বহু কষ্টে এবং বিশেষ চেষ্টায় সুপ্রকাশকে আনাইয়াছে।

সন্ধ্যা হইতেই অভিনয় হইবার কথা। কিন্তু দেখিতে দেখিতে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। ষ্টেজের ভিতরে সাজসজ্জা ও প্রসাধনের অন্ত নাই। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিয়া অভিনয় আরম্ভ না হওয়ায় ইতিমধ্যে দর্শকবৃন্দের মধ্যে গুঞ্জন আরম্ভ হইয়াছে।

কনসার্ট বাজাইয়া বাজাইয়া বাদ্যকারীর দলও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। আর অপেক্ষা করা যায় না। ক্রমাগত একটার পর একটা কনসার্ট বাজাইতে তাহাদের বিরক্ত ধরিয়া উঠিতেছিল।

অবশেষে থিয়েটার আরম্ভ হইল। ড্রপ সিন উঠার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকবৃন্দ আনন্দে হৈ চৈ করিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে অভিনয় বেশ জমিয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে আগত অভিনেতাদের ষ্টেজে আবির্ভাব হইলেই গ্রামের কৌতূহলীর দল আনন্দে উৎসাহে চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিয়া আঙ্গুল দিয়া অভিনেতাদের

দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। তবে সকলে যতদূর মনে করিয়াছিল আজিকার অভিনয় তাহার চেয়ে মোটের উপর ভালই হইল। এতদিন জমীদার বাড়ীতে যে সব জাঁক-জমক অভিনয় দেখিয়াছে তাহার চেয়ে সেদিনকার অভিনয় রাত্রি খারাপ লাগিল না।

তারকের বিবাহ হইয়াছে কলিকাতায়। নূতন বৌ সুনীতি কলিকাতার সব থিয়েটারই অনেকবার করিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। কাজেই পাড়াগাঁয়ের থিয়েটার সে এই প্রথম দেখিল। এই ষ্টেজ, সিন, আলো বিশেষ করিয়া দর্শকবৃন্দের আচার ব্যবহারে সে বড়ই আমোদ বোধ করিতেছিল। একদল মেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল এবং কথায় কথায় থিয়েটারের নানা রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতেছিল অপরূপ ভঙ্গিতে। এই থিয়েটারের মত থিয়েটার এ অঞ্চলে কোথাও নাই বা হইতে পারে না সে বিষয়ে তাহারা নিঃসন্দেহ। তবে কলিকাতার সঙ্গে তাহারা তুলনা করিতে চায় না। তাহারা বিশেষ করিয়া জানে নূতন বৌ কলিকাতায় মেয়ে। এসব জিনিষ তাহার কাছে অতি তুচ্ছ বোধ হইতে পারে। কিন্তু হইলে কি হইবে—শ্বশুরবাড়ীর দাবী হিসাবে ইহা তাহার কাছে সব চেয়ে ভাল বলিয়া স্বীকার করিলে তাহারই আদর গ্রামমহলে বাড়িয়া যাইবে বই কমিবে না।

সুনীতি চুপ করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে একটু আধটু সারা শব্দ দিয়া সমর্থন বা প্রশংসা করে। এই ধরণের থিয়েটার তাহার মন্দ লাগিল না। তাহার স্বামীর স্ত্রীভূমিকার অভিনয় যতই দেখে ততই তাহার হাসি পায়, ভালও লাগে।

থিয়েটার ভাঙিতে রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। তারপর উৎসাহী

জীবন-মৃত্যু

অভিনেতা ও দর্শকদল হৈ চৈ ও চীৎকার করিতে করিতে নিজের নিজের বাড়ী চলিয়া গেল।

থিয়েটার জমিয়াছে ভাল বলিয়া ভবানীর আনন্দের সীমা নাই। অপ্রকাশকে ধন্যবাদ জানাইয়া তাহার সহানুভূতি কামনা করে। কলিকাতার বন্ধুমহলে অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা চলিতেছিল। ভবানী গিয়া তাহাদের প্রশংসা করিতে লাগিল।

তারক ও ভবানী দুইজনে মিলিয়া অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে বলিয়া অভিযোগের পর অভিযোগ আসিতেছে। কিন্তু দুই ভাইয়ের সেদিকে গ্রাহ্য নাই। এই উৎসবমুখর রাত্রে তাহাদের কর্ম্মচাঞ্চল্য যেন বাড়িয়া গিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

তারকের শুইতে রাত্রি হইল। থিয়েটার ভাঙিয়া গেলে সব গোছগাছ করিয়া হাত-মুখের রঙ পেণ্ট তুলিয়া সে শুইতে গেল। বিবাহ বাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। এ কয়দিন তাহাদের কলরবে হট্টগোলে রাত্রে কাহারও বিশেষ ঘুম হইত না। কিন্তু আজ থিয়েটার দেখিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাওয়ায় হৈ চৈ করিবার মত শরীর ও মনের উৎসাহ ছিল না কাহারও। সুতরাং থিয়েটার শেষ হইবার পূর্ব্বেই কতক এবং পরে কতক যেখানে সেখানে শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে।

তারক ঘরে আসিয়া ঢুকিল। এতদিন সে অনায়াসে এবং নির্ব্বিকার-ভাবে ঘরে শুইতে আসিত। আজ তাহার বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। কাল তাহাদের ফুলশয্যা গিয়াছে। কিন্তু গোলমালের ভিড়ে এবং চারিদিক হইতে ক্রমাগত ফিস্‌ফাস্‌ ও আড়িপাতার ভয়ে সে রাত্রে কোন কথাবার্ত্তা বলে নাই। নবপরিণীতা বধূরও অবস্থা সেইরূপ ছিল। কিন্তু আজিকার রাত্রে তাহার সে সঙ্কোচ না থাকিলেও ঘরে ঢুকিতে তাহার বড় বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। বুকের ভিতর দ্রুত স্পন্দন হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের মত চমক দিয়া যায় যেন। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সুনীতি তাহার বৌ পালঙ্কের বিস্তৃত শয্যার একাংশে জড়সড় হইয়া শুইয়া আছে। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া তারক কয়েকবার তাহার গায়ে হাত দিল। হাত দিতেই মনে হইল তাহার

শরীরের ভিতর দিয়া একটা বিদ্যুতের প্রবাহ ছুটিয়া গেল। বার কয়েক ধাক্কা দিয়াও তাহার নড়িবার লক্ষণ দেখা গেল না। তারক দেখিল সুনীতি অঘোরে ঘুমাইতেছে। নিজেরও ঘুম পাইয়াছিল কম নয়। বিক্রম দেখাইয়া জোর করিয়া জাগাইতে সে পারিত কিন্তু তাহার আর ভাল লাগিল না। অনর্থক এই শেষ রাত্রের দিকে জাগিয়া থাকিতে সে স্বস্তি বোধ করিল না। তাহারই পাশে নিজের অংশে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যে তারকের নাক ডাকিতে লাগিল।

পরের দিন রাত্রে সুনীতির সহিত তারকের নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এই গ্রামের অবস্থা দিনে দিনে কেমন করিয়া পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে তারক তাহা বিচিত্র ভঙ্গিতে বলিতেছিল। দামোদরের রূপের কথা উঠিল। এই শুষ্কপ্রায় নদী কেমন করিয়া একদিন ভীষণ ভাব ধারণ করে। কেমন করিয়া চারিদিক ভাসাইয়া ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া তোলে। এই পার ঘাট—ঐ গিরিরাণী আশ্রম এবং কেমন করিয়া গ্রামের সৃষ্টি হইল তাহা সুনীতি অবাক-বিস্ময়ে শুনিতে লাগিল।

অপ্রকাশ ও সুপ্রকাশ দুই ভাই এখন গ্রামের জমীদার। তিন পুরুষের জমীদারী এই গ্রাম। ইহাদের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত গ্রামের অনেক পরিবর্ত্তন ও উন্নতি দেখা দিয়াছে। ইন্দ্রাণী গ্রামের আদি জমীদারের কোন অস্তিত্ব এ গ্রামে আর কিছুই নাই। তবে তাহার স্মৃতি কেবল রহিয়া আছে। কিছুদিন আগেও একটা ভিটা ছিল তাহাও অপ্রকাশ ভাঙিয়া বাগান করিয়া লইয়াছে। তাহাদের কথা এখন সকলের কাণে কাণে কাহিনীর মত ঘুরিয়া বেড়ায়। বর্ত্তমান জমীদারের

লোক ভাল। প্রজাদের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া দিন কাটায় না। কিসে গ্রামের উন্নতি হয় সে চেষ্টা সর্ব্বদাই তাহারা করে।

গ্রামের মধ্যে এক বিস্তৃত যায়গা লইয়া জমীদার বাড়ী গড়িয়া উঠিয়াছে। ত্রিমহলা বাড়ীর পাশে ঠাকুর বাড়ী। ঠাকুর বাড়ীটাকে সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কৃষ্ণ-রাধিকার মূর্ত্তি বিরাজমান।

আগেকার জমীদার শাক্ত। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবী গ্রামের প্রান্তে এতদিন অবজ্ঞেয় অবস্থায় পড়িয়াছিল। অবিনাশের স্ত্রী শেফালীর চেষ্টায় সেখানে গিরিরাণী আশ্রম তৈয়ারী হইয়াছে। কালী মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে বলিয়া সেদিকে এখন লোক যাতায়াত করিতে দেখা যায়।—এক যায় এক আসে। যাহারা বিতারিত তাহাদের আর স্থান নাই। এমন কি তাহাদের স্মৃতি চিহ্ন পর্য্যন্ত যাহাতে না থাকে তাহারও চেষ্টার ক্রুটী করে না কেহ।

একদিন যাহারা এই গ্রামের আদি পুরুষ ছিল। যাহাদের অনুগ্রহে শত শত লোক এখানে আসিয়া বাসা বাধিয়াছে, আজ তাহাদের বংশ পর্য্যন্ত গ্রামে নাই। শোনা যায় অপরেশবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র সম্পত্তির মালিক হয়। কনিষ্ঠ পুত্র একদিন জমীদারীর খাজনা বর্দ্ধমানে পাঠাইতে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। ফলে জমীদারী নীলাম হইয়া যায় এবং অপ্রকাশের পিতামহ সে সম্পত্তি নীলাম খরিদ করিয়া লন। তাহার পর হইতে এই গ্রামে আসিয়া তাঁহারা সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। অপরেশবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র জমীদারী ফিরাইয়া আনিবার বহুচেষ্টা করিয়া ছিলেন কিন্তু তাহা হইল না। অগত্যা সামান্য জমীজমা লইয়া কষ্টে স্বষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এ রকম ভাবে আর বেশীদিন

চলে নাই। নূতন জমীদারের শাসন দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এতদিন রাজসিংহাসনের অধীশ্বর হইয়া যে সুখভোগ ইঁহারা করিয়া আসিতেছিলেন তাহার মূলে আঘাত পড়ায় ব্যথিত হইয়া তিনি সপরিবারে মাতুলালয়ে চলিয়া গেলেন আসানসোলে। ইহার পর আর কখনও তাঁহারা এখানে আসেন নাই। তাঁহারা গ্রাম ত্যাগের সময় যে করুণ বিষাদ পটভূমিকার সৃষ্টি করিয়া যান তাহা আজিও এখানকার লোকেরা ভোলে নাই। তারকের এই সব কাহিনী শুনিতে শুনিতে সুনীতি তন্ময় হইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল। জীবন-মৃত্যুময় বৈচিত্র্যে জীবনের যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাহা রোধ করিতে পারে কে? এক আসে, এক যায়। ক্রমাগতই ইহা চলিয়া আসিতেছে। জীবন বৈচিত্র্যময় বলিয়া মৃত্যুমুখী এবং মৃত্যু বৈচিত্র্যময় না হইলে জীবনের কোন মানে হয় না। এই যে জীবন-মৃত্যুর অচ্ছেদ্য বন্ধন ইহা সৃষ্টির আদি হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং যুগ-যুগান্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে।

ইন্দ্রাণী গ্রামেরও সেইরূপ অনেক কিছু ঘটিয়া গেল। প্রথমে দেখা দিল নির্জ্জন প্রান্তর, কোথা হইতে কে একজন আসিয়া এই অনাবাদী জমী দখল করিয়া চাষ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নির্জ্জন প্রান্তর, ডাঙ্গা-মাঠ বাসের যোগ্য হইল। এক এক করিয়া বস্তী বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহা ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইল। কত লোকের জীবন-মৃত্যুর ভিতর দিয়া অবশেষে তাহা গড়িয়া উঠিল। ঘর থাকিল, বাড়ী থাকিল, জমী থাকিল, নদী থাকিল; চলিয়া গেল একদল নরনারী মৃত্যুর পরপারে।

সেগুলি ভোগ করিল আর একদল নরনারী। সেখানে দেখা দিল অপরেশবাবু, তাঁহার স্ত্রী ইন্দ্রাণী এবং কর্ম্মচারীবৃন্দ। তাহারাও চলিয়া গেল।

এমনি ভাবে চলিতে চলিতে আবার একদল নর-নারীর বিচিত্র সমাবেশ দেখা দিল দামোদরের তীরে ইন্দ্রাণী গ্রামে। পল্লীর রূপ মাধুরীর অন্ত নাই। নদীর কলস্রোত, আম্রবনের কুঞ্জ মুখরিত কোকিল, মেঠোপথের সুরহারা গতি, আকাশ, বাতাস, সবুজ বনানী এবং আরও কত কি!

অমরনাথ অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। তাহার পল্লীপ্রীতি সবারই কাণে কাণে বাজিয়া ওঠে এখনও। কমল চাকুরী উপলক্ষে রেঙ্গুণে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে সে এক বর্ম্মী মেয়ে বিবাহ করিয়া বহুদিন হইল কলিকাতাতেও আসে নাই। লতিকার বিবাহ হয় লক্ষ্ণৌয়ে। সেখানে ছেলে-পুলে লইয়া কিছুদিন হইতে কষ্ট পাইতেছে, তাহার উপর বৈধব্য দশা নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে। সংসার চালাইতে তাহাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। গ্রামে আসিবার জন্য এখনও তাহার মন কেমন করিয়া ওঠে কিন্তু রাস্তা ভাড়া আর জোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বিশ্বজিতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার বংশ লোপ পাইয়াছে। কনকলতা অনেকদিন হইল মারা গিয়াছে এক সন্তান প্রসব করিতে গিয়া। বাড়ীখানা কেবল ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়া আছে। কিন্তু গ্রামে তাহার স্মৃতি স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে 'বিশ্বজিত স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার'।

ভবানী ও তারক এখন কলিকাতায় বাস করিতেছে। বহুদিন তাহারা দেশে আসে নাই। তাহাদের বাড়ীর আনাচে-কানাচে কত ময়লা, আগাছা জমিয়া আছে ঠিক নাই। ভবানী বলে যে, বাড়ী যাইবার দিন কয়েক আগে পরিষ্কার করাইলেই চলিবে।

জীবন-মৃত্যু

গ্রামের জমীদারী ভাগ বিক্রয় হইতে হইতে বহু অংশে দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের বহুলোক এখন গ্রামের জমীদার হইয়া বসিয়াছে। সুপ্রকাশের বংশ নাই। অপ্রকাশের বংশ গ্রামের জমীদারীর সামান্য অংশ লইয়া দেখা-শোনা করিতেছে। ইহাতেই তাহাদের সংসার কায়ক্লেশে চলিয়া যায়। কিন্তু গ্রামের লোকেরা এখনও তাহাদের খাতির করে সব চেয়ে বেশী. তাহারা বলে ইহারাই গ্রামের আদি জমীদার এবং আসল সম্মানী ঘর।

গিরিরাণী আশ্রমের অবস্থা সমানই আছে। শেফালী ইহার জন্য যে সম্পত্তির ব্যবস্থা পাকা করিয়া দিয়াছে তাহার আয়ে আশ্রম ভালভাবেই চলিতেছে। এখনও সেখানে অতিথি গেলে অভুক্ত অবস্থায় ফেরে না।

চন্দ্রনাথ নাই। তাহার সমাধি ফুলে ও লতাপাতায় শোভিত থাকে। দর্শকবৃন্দেরা এই লোকটীর সমাধিতে এখনও সম্মান দেখাইয়া যায়। অন্য একজন মহান্ত আসিয়াছে। এখন সেই সব দেখাশুনা করে।

পারঘাটের নৌকা তেমনি ভাবে এখনও যাত্রী পারাপার করে। পাশের অশ্বত্থ গাছটি সেই রকম দাঁড়াইয়া পথিকদের আশ্রয় ও ছায়া দেয়। কেবল তাহার একটী বড় ডাল ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড এক ঝড়ে তাহার এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

দামোদর নদী এখনও তেমনিভাবে বহিয়া চলিতেছে। গ্রীষ্মকালে কোন কোন স্থান দিয়া কুলুকুলু শব্দে বহিয়া যায় কিন্তু বর্ষাকালে তাহার রূপ প্রবল আকার ধারণ করে। বছরের পর বছর সে সমান ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন নাই।

শেষ